বিয়ের সাতকাহন

রলী

বিয়ের ব্যাপারে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু অনার্সে ভর্তির পর আত্মীয়দের পীড়াপীড়িতে আমার মা–বাবা বিয়ে দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। আগের কনে দেখার নানান বৈচিত্রময় ঘটনা আজ নাই বা লিখলাম।

২০০১ সাল, জানুয়ারির পাচ তারিখ। আম্মু বললেন, আজ তোকে দেখতে আসবে। মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হাসলাম, এ আর নতুন কি! যথাসময়ে ছেলে, ছেলের মা, বোনের বাচ্চা ও বোন আমাকে দেখে গেলেন।

মাঝে বেশ কিছুদিন কোনো সাড়া না থাকলেও আবার পূর্ণ উদ্যমে কথাবার্তা শুরু হলো। ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে আম্মু আমাকে অবাক না নির্বাক করে দিয়ে বললেন, মার্চের ১ তারিখ তোর বিয়ে। বিয়েটা বাতিল ভেবে বেশ স্বস্তি পাচ্ছিলাম, এর মধ্যে তারিখ শুনে মাথায় বজ্রপাত হলো। সেই মুহূর্তের অনুভূতি প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। বললাম, এতোদিন পর হঠাৎ করে আমাকে না জিজ্ঞাসা করে তারিখ করে ফেললে?

আম্মু বললেন, কেন, সময় দিয়ে তুই করবিটা কি?

আমি সেখানেই চুপ, বুঝলাম কিছু বলা বৃথা।

মান্ধাতার আমলের মতোই আমার মনটাকে কেউ বুঝলো না। কেউ জিজ্ঞাসা করলো না এ বিয়েতে বা এ ছেলের ব্যাপারে মত আছে কিনা। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হচ্ছে তখনো ছেলেকে দেখা তো দূরের কথা তার ছবি পর্যন্ত দেখিনি। যদিও ছেলে আমাকে দুবার দেখতে এসেছিলেন কিন্তু আমি তাকাইনি। যাকে জিজ্ঞাসা না করে বিয়ের তারিখ পর্যন্ত করে ফেলা হয়েছে, তার ছেলের ছবি দেখতে চাওয়াটা একটি পরিহাস মাত্র। তবু যখন জানতে চাইলো ছবি দেখবো কি না তখন বললাম, বিয়ে যখন ঠিক, তখন দেখতে যাই হোক বিয়ে করতেই হবে।

তাছাড়া বিয়ে করতে যেহেতু রাজি নই সেহেতু আমার কাছে সবই সমান।

ফেব্রুয়ারির শেষ দিন আমাদের কলেজ থেকে একটি ইনডাস্ট্রিয়াল টুর ছিল। সারা দিন সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের সঙ্গে কাটালেও কাউকেই বলিনি আগামীকাল আমার বিয়ে। সেটা যে কতো কষ্টের ছিল আমি জানি। রাতে দুশ্চিন্তায় জ্বর ও মাথা ব্যথা শুরু হলো।

বিয়ের দিন এক আত্মীয়া বললেন, আকদ হচ্ছে একটু হলুদ দেয়ার ব্যবস্থা করো। তখনই থৃ পিস বানিয়ে হাতের কাজ করার জন্য রক্ষিত একটি লাল থান কাপড় ও কাজিনের হাতের লাল চুড়ি পরিয়ে হলুদের আয়োজন করা হলো। আমি কান্না সংবরণ করতে পারলাম না।

বিকেলে পারলার থেকে আমাকে সাজিয়ে আনা হলো। সন্ধ্যায় মেহমানরা এলে গহনা পরানোর সময় পেলেও শাড়ি পরানোর সময় তখনো পায়নি। কাজী সাহেব এসে গেলেন কবুল বলাতে। মেক্সির উপর শাড়ি ও ওড়নায় ঘোমটা দিয়ে কবুল পড়ানো হলো।

অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষে বরের বন্ধু–বান্ধব এবং আমার কাজিনরা যখন বরকে বাসরঘরের দিকে টানাটানি করছিল তখন আমার আরেকবার বোকা হবার পালা। কারণ বাসর সাজানো হয়েছে বা বর আজ থাকবে সে সম্বন্ধে আমাকে জানানো হয়নি। পরে তার কাছে জেনেছি এ বিষয়ে তিনিও জানতেন না। তাকেও এক প্রকার জোর করেই বাসরঘরে নেয়া হয়েছিল।

যাহোক বরকে নিয়ে বিছানায় বসানো হলো। আমাকেও পাশে বসানো হলো। ততোক্ষণে দুশ্চিন্তা, ভয় আর বিরক্তিতে জ্বর, মাথাব্যথা দুটোই তুঙ্গে। দুটো নাপা আনিয়ে খেলাম অবশ্য আগের রাত থেকে প্রতি বেলাতেই দুটো করে নাপা খাচ্ছিলাম।

এক সময় সবাই ঘর থেকে চলে গেলে আমিও কিছু না বলে চলে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বসতে বললেন। কিছু সৌজন্যমূলক কথার পর আমাকে বাসরের আংটি পরিয়ে বললেন, ওজু করে এসো, একত্রে দুই রাকাত নামাজ পড়বো।

আমি অন্য রুমে গিয়ে বিয়ের সাজ পোশাক পাল্টে ফ্রেশ হয়েও রুমে যাচ্ছিলাম না। আত্মীয়দের জোরাজুরিতে রুমে গিয়ে কোনো মতে নামাজ পড়লাম।

তিনি বললেন, তুমি চেঞ্জ করে এসেছো অথচ বিয়ের সাজে তোমাকে ঠিকভাবে দেখিওনি।

আমি তারও কোনো উত্তর না দেয়াতে বললেন, তুমি বোধ হয় খুব টায়ার্ড, তাহলে শুয়ে পড়।

ভয়ে আর সংকোচে সারা রাত এক পাশে ফিরে পাথরের মতো পড়ে রইলাম। এর মধ্যে অবশ্য তিনি জ্বর দেখার জন্য একবার আমার হাত ধরেছিলেন। আমি সরিয়ে নিয়েছি। তারপর ভোরের দিকে একবার কপালে হাত দিয়ে দেখেছেন।

সারা রাত তিনি একটুও ঘুমাননি আমি বুঝেছি কিন্তু আমি জেগে রয়েছি সেটা তিনি বোঝেননি। ভেবেছেন আমি খুব ঘুমাচ্ছি। ভোর হতেই উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

কিছুক্ষণ পর আমার নানা বললেন, বরকে রেখে বাইরে ঘুরছিস কেন?

নানার কথায় তাকে নিয়ে ছাদে বেরিয়ে এলাম। সকালের দিকে বরের কিছু আত্মীয় এলে তাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তখনই প্রথমবারের মতো তাকে দেখি। তবে প্রথম দেখাতেই শুধু নয় গতরাতের আচরণে তাকে বেশ সহনশীল, অমায়িক আর ভদ্র মনে হলো।

সবাইকে শরবত পরিবেশন করা হলো। তিনি গ্লাসের অর্ধেকটা খেয়ে আমাকে ফেরত দিলেন। সেটা বুঝে সবার অলক্ষ্যে বাকিটুকু খেয়ে নিলাম। তাতে তার এতোক্ষণের হতাশা কিছুটা কাটলো।

সেদিন আমার সবচেয়ে আদরের কাজিনের জন্মদিন ছিল। এটা তিনি জানতেই আমাকে নিয়ে মার্কেটে গিয়ে গিফট কিনে আনলেন। এর মধ্যে তার সঙ্গে টুকটাক কথা হচ্ছিল। সন্ধ্যায় তিনি চলে যেতে চাইলেও আমার ফ্যামিলি তাকে যেতে দেয়নি।

রাতে সবাই শুয়ে পড়লে একদল কাজিনের সঙ্গে আড্ডায় বসলাম। এভাবে রাত আড়াইটা পার হলে তাদের তাড়ায় আমি একটি কবিতার বই নিয়ে রুমে গেলাম। কবিতা আমার ভীষণ পছন্দ। কবিতা শুনবেন কি না জিজ্ঞাসা করলে তিনি না করতে পারলেন না। তিনিও কবিতা ভালোবাসেন। কিন্তু সে মুহূর্তে হয়তো সেটা আশা করেননি। কবিতা পড়ে শোনাচ্ছিলাম, এভাবে বাজলো রাত সাড়ে তিনটা। ততোক্ষণে তার চোখ জুড়ে প্রচণ্ড ঘুম। বললেন, এখন কবিতা থাক আরেকদিন আবার শুনবো। এখন ঘুমুতে এসো।

আমি বই রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, কবিতা ভালো লাগেনি?

ধন্যবাদ, খুবই ভালো লেগেছে। বলে সংকোচে আমার গালে হালকা একটি চুমু খেলেন। আমি কেপে উঠলাম। ভয় আর লজ্জায় মুড অফ হয়ে গেল বলে তিনি আর বাড়েননি। এক পাশে চেপে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। পরদিন সকালে তিনি চলে গেলেন।

এভাবে এলো মার্চের সাত তারিখ। সেদিন কোরবানির ঈদ ও আমার জন্মদিন দুটোই ছিল। তিনি দুপুরের আগেই এলেন, বিকেলে আমাকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। জন্মদিন উপলক্ষে দুটো দুই ফ্লেভারের কেক নিয়ে এলেন। আমাকে সুন্দর একটি আংটি গিফট করলেন। আমার দেবর, ননাস ও তার বাচ্চা বেড়াতে এলো। জন্মদিনে বেশ আনন্দ হলো। এ কদিনে তার সঙ্গে মোটামুটি একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠলেও আমি দূরত্ব বজায় রেখেছি। তখনো তাকে আপনি করেই সম্বোধন করছিলাম। দিন কেটে যেতে থাকলো। আমাদের ভালোবাসাটা গভীর হতে গভীরতর হলো। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে শ্বশুরবাড়ি তুলে আনা হলো।

বিয়ের প্রায় পাচ বছর পর এটাই বলবো, আমরা খুবই সুখী। আমাদের মধ্যে আছে বিশ্বাস, সহনশীলতা, সহানুভূতি – সবই। আমরা একে অপরের ভালো বন্ধু। সৃষ্টিকর্তা আমাকে একজন পারফেক্ট লাইফ পার্টনার দিয়েছেন।

পূর্ব গোড়ান, ঢাকা থেকে

খামারবাড়ি

কথা

সকালের আবশ্যকীয় গোসলটি সেরে নাশতা রেডি করে বেডরুমে গেলাম। নীরব তখনো ঘুমাচ্ছিল। বললাম, এই, ওঠো না, আটটা বেজে গেল। ওঠো লক্ষ্মী, গোসল করে নাশতা করো। অফিসে যেতে আজো দেরি হয়ে যাবে তো!

নীরব চোখ দুটো বন্ধ রেখেই হাত ধরে আমাকে তার বুকের ওপর শুইয়ে দিল। মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে আমার ঠোট দুটো মুখে পুরে নিল।

বললাম, এই অসভ্য, ছাড়ো! সারা রাত আদর করেও সাধ মেটেনি!

তোমাকে যতোই আদর করি আমার যে তৃষ্ণা মেটে না গো।

আমি একটানে তাকে শোয়া থেকে বসিয়ে দিয়ে বললাম, ওঠো তো, আদর করার সময় পাবে, আগে অফিসটা সামলাও।

নীরব উঠে বাথরুমে গেল। এক সঙ্গে নাশতা করলাম। তাকে নিজ হাতে প্রতিদিন নাশতা খাইয়ে দিই। নীরবও আমাকে খাইয়ে দেয়। সকালে খুব তাড়াহুড়ো করে তার প্যান্ট, শার্ট, শু, মোজা, টাই, রুমাল গোছাতে হয়। অবশ্য আমি আগে থেকেই ঠিক করে রাখি নীরব কোনদিন কোন প্যান্ট–শার্ট পরে বের হবে; কোন প্যান্টের সঙ্গে কোন শার্ট, কোন টাই মানাবে। তাই আমাকে খুব বেশি সমস্যায় পড়তে হয় না। তাকে বিদায় জানাতে দরজায় দাড়াই। নীরব বের হবার সময় আমার কপালে, গালে, ঠোটে মোট পাচটি চুমু দিয়ে বের হয় সব সময়। আমিও তার কপালে, ঠোটে চুমু দিয়ে বিদায় জানাই।

সেদিন যাবার সময় বললাম, এই, আমার পিল ফুরিয়ে গেছে।

সে তোমাকে বলতে হবে না। কবে তোমার পিল লাগবে আমি ঠিকই তার হিসাব রাখি।

আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে তাকে আরো একবার চুমু দিই। নীরবও যথাযথ জবাব দিয়ে অফিসে রওনা হয়।

সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত কেটে যায় নীরব কি খেতে পছন্দ করে। কি রান্না করবো আজকে এসব ভাবতে ভাবতে এবং তার পছন্দ অনুযায়ী আইটেমগুলো রান্নার আয়োজন করতে করতে। এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করি নীরব কখন ফোন করবে। সে প্রতিদিন অফিসে পৌছে এ সময় ফোন করে জানতে চায় আমি কি করছি, বাসায় একা থাকতে খারাপ লাগছে কি না। আমার কষ্ট হবে ভেবে সে ফোনে বলে, বেশি কিছু রান্নার দরকার নেই। সংক্ষেপে রান্না সেরে গোসল করে খেয়ে নিও। আমি লাঞ্চ আওয়ারে আসছি। তুমি আবার আমার জন্য না খেয়ে বসে থেকো না, কেমন!

সে আসে ঠিক দুটোয়। আমি হাতের কাজগুলো সেরে গোসল করে তার জন্যই অপেক্ষায় থাকি এ সময়। ডোরবেলের শব্দ শুনে দৌড়ে দরজা খুলি।

সে ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করে, সারা দিন তুমি কেমন ছিলে? খাওনি এখনো?

আমি না বলতেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিয়ে বলে, পাগলী, এতো বেলা পর্যন্ত না খেয়ে থাকলে কেন? আমিও তার গালে টুক করে একটা চুমু দিয়ে বলি, তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও, আমি খাবার দিচ্ছি।

দুজনে ভাগাভাগি করে খাওয়ার পর্বটা সেরে নিই। অর্থাৎ আমি চাই তার পছন্দের খাবারটা তাকে একটু বেশি খাওয়াতে। আর সে চায় সেটা যেন আমি খাই। এ নিয়ে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। সে বলে, তুমি খাও, তুমি খেলেই বেশি মজা পাবো। আর আমি বলি, তুমি খাও, তুমি খেলেই আমার খাওয়া হয়ে যায়।

অবশেষে দুজনে একই প্লেটে খেতে বসি। আমি তাকে খাইয়ে দিই আর সে আমাকে। খাওয়া শেষে সে রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আমি সবকিছু গুছিয়ে তার কাছে যাই।

কথা বলার ফাকে ফাকে সে আমাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দেয়। দুপুরে আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে যাই না। কারণ তখন সীমান্তে পৌছতে চাইলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমরা আর ফিরে আসতে পারবো না। কাজেই তার অফিসে যেতে দেরি হয়ে যাবে। কিছু সময় বিছানায় দুজন গড়াগড়ি, জড়াজড়ি করে, চুমু দিয়ে এবং উপর থেকে হাতের কাজগুলো সম্পন্ন করে সে উঠে দাড়ায়। দরজায় দাড়িয়ে আমাকে চুমু দিয়ে বলে যায়, এখন ঘুমাবে না কিন্তু। তাহলে শরীর খারাপ লাগবে আর তুমি মুটিয়ে যাবে। চারটার মধ্যে আমি তো এসেই পড়বো। এটুকু সময় বই পড়ে বা টিভি দেখে কাটিয়ে দিও, কেমন!

সে চলে যাবার পর আমিও বই পড়ে কিংবা রিমোট টিপে একটার পর একটা চ্যানেল পাল্টে অথবা কাপড়ে ফুল তুলে সময়টা কাটাই। অফিস শেষে সে সোজা বাসায় চলে আসে। প্রায় প্রতি বিকেলেই আমরা ঘুরতে বের হই। কখনো পার্কে, কখনো শপিং সেন্টারে, চিড়িয়াখানায়, কখনো নির্জন কোনো নদীর তীরে, কখনোবা শুধু রিকশায় ঘুরে বেড়াই দুজন। সে আগেই ফোনে আমায় বলে রাখে, তুমি রেডি থাকবে। ঠিক সাড়ে চারটায় বের হবো। যেদিন বাইরে যাওয়া হয় না, সেদিন আমরা দুজন জড়াজড়ি করে শুয়ে টিভি দেখি। রোমান্টিক সিনেমাগুলো তার খুব পছন্দের।

সে বাইরে থেকে আসার সময় ছবি নিয়ে আসে। সিনেমার রোমান্টিক দৃশ্য দেখে নীরব রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত হয়ে পাগলের মতো আদর করতে থাকে আমাকে। আমিও বুকের সঙ্গে তার মাথাটা চেপে ধরে পাল্টা উত্তর দিই।

টিভি চলছে তো চলছেই, সেদিকে আমাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরা দুজন তখন ভেসে যাই অজানা সুখের প্রবল স্রোতে। স্বর্গীয় সুখের সবটুকু সুধা পান করে এক সময় ক্লান্ত হয়ে দুজন জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকি।

একটু পর আমি উঠে বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাশতা তৈরি করতে রান্নাঘরে যাই। নীরবও গিয়ে আমার পেছনে দাড়িয়ে দুইহাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ এনে বলে, *সারা* দিন অফিসে থাকি, বাসায় ফিরলেও তুমি দূরে দূরে থাকো। তোমার পাশে সব সময় আমাকে রাখতে চাও না তুমি?

এ কথা বলো কেন?

সারা দিন তুমি কতো কাজ করো। বিকেলের নাশতাটা আমি তৈরি করলে ক্ষতি কি?

তুমিও তো সারা দিন অফিসে কতো কাজ করো, আমি কি পারি অফিসে গিয়ে তোমাকে একটু সাহায্য করতে? অতএব, আমার কাজ আমাকেই করতে দাও। তুমি সোফায় গিয়ে বসো, আমি চা নিয়ে আসছি।

তা হবে না, আমরা দুজনেই নাশতা তৈরি করবো। অবশেষে আমি পানি গরম করি আর সে তাতে চা পাতা দিয়ে নামিয়ে আনে।

ছুটির দিনেও আমার কাজগুলো সে ভাগাভাগি করে নেয়। আমি তরকারি কাটলে সে রান্না করে। তার রান্নার হাত দারুণ। সে কাপড় কেচে দেয়, আমি সেগুলো ছাদে শুকাতে দিই। খাবার আগে আমি তরকারি গরম করলে নীরব টেবিলে খাবার রেডি করে। এভাবে আমাদের সারা দিনের কাজগুলো শেষ করে রাতে দুজন বিছানায় যাই।

সে কখনো আমাকে ফেলে একা শোয় না। সেখানে গিয়েও ভাগাভাগি। সে মশারির দুই কোনা টানাবে আর আমি দুই কোনা। এসব কাজ নিজ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করে। তার মতে, এতে নাকি পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা আরো গাঢ় হয় এবং কাজগুলো কম কষ্টে, কম সময়ে সহজেই সম্পন্ন হয়। তাছাড়া আমার সামান্য কষ্ট হোক, সে তা সহ্য করতে পারে না।

আমার শরীর থেকে সামান্য একটি পশম খসে পড়লেও তার অস্থিরতা, ছটফটানি বেড়ে যায়। আর আমি সহ্য করতে পারি না, সারা দিন অফিসের কাজ শেষে বাসায় এসেও কষ্ট করুক। এ নিয়ে দুইজনের মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি, মান-অভিমান। তার সামান্য কথায় আমি গাল ফুলিয়ে রাখি অনেকক্ষণ।

নীরবও নানা কৌশলে, একটু একটু জল দিতে দিতে রুক্ষ মাটিকে সিক্ত করে। এ অবস্থায় আমি বসা থাকলে সে হুট করে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বলে, তুমি যদি আমার সঙ্গে কথা না বলো তবে এখান থেকে উঠবো না।

আমি যদি ওই সময় শুয়ে থাকি, নীরব আমার বুকের ওপর মাথা রেখে বলবে, তুমি যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আদর না করবে ততোক্ষণ উঠছি না।

তার এই ছেলেমানুষী দেখে আমি নিজের অজান্তেই হেসে তার মাথাটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বলি, এই পাগল, তোমার সঙ্গে রাগ করতে পারি? তুমি ছাড়া আমার কে আছে বলো।

নীরবও আমাকে *পাগলী* বলে বুকে জড়িয়ে ধরে। আসলে এ ভালোবাসাটুকু পাবার জন্যই আমি কৃত্রিম রাগ করি তার ওপর।

বিছানায় নীরব প্রথমে বিভিন্ন কায়দায় আমাকে উত্তপ্ত করে আমার ইন্দ্রিয়গুলো জাগিয়ে তোলে। তার অভিজ্ঞ হাতের সুনিপুণ কারুকাজে পাগল হয়ে যাই। সে বিছানায় গিয়েই আমার ওপর ওঠে না এবং কাজ শেষে হুট করে নেমেও পড়ে না। সে শৈল্পিক ভঙ্গিতে আমার ঠোট, গলা, চিবুক, কপাল, কানের লতি, বুক, পেট, নাভিতে আদর করতে থাকে অনবরত। ব্লাউজের ওপর থেকে আমার বুকের উন্নত পাহাড়দ্বয়কে উত্তপ্ত করে তোলে। হাত এবং জিভ দিয়ে আমার সারা শরীরে সুড়সুড়ি দিয়ে উত্তেজিত করে তোলে। আমি অস্থির হয়ে দুহাতে তাকে খামচে ধরে বলি, নীরব, আমি মরে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি আমাকে বাচাও।

নীরব আদর করতে করতে আমার শরীর থেকে একে একে ব্লাউজ, ব্রা, শাড়ি খুলে ফেলে। আমি আরো অস্থির হয়ে পড়ি। সে যখন আমার বুকের নগ্ন শ্বেতপদ্ম দুটো নিয়ে আদিম খেলায় মেতে ওঠে আমি পাগলের মতো তার চুল খামচে ধরি। আমার বুকের রসালো আতা দুটো মুখে পুরে নিয়ে সে যখন রস আস্বাদন করে আমি দুইহাতে তার পিঠ খামচে ধরে বলি, নীরব, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

দুটি দেহে যখন শুরু হয় উদ্দাম নৃত্য, শিরায় শিরায় যখন জেগে ওঠে অদ্ভুত শিহরণ, হৃদয়তন্ত্রীতে যখন বেজে ওঠে কামনার লহরি তখনই সে দক্ষ মাঝির মতো মহা সমুদ্রে বৈঠা নিয়ে নেমে পড়ে। আমার গোপন ঝরনাধারার গিরিখাতে সে তখন খুজে খুজে ঝিনুক তুলে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুখের আবেশে আমি দুই পা দিয়ে তাকে পেচিয়ে ধরি। সুখের সাগরে ক্রমশ দুজন ডুবে যেতে থাকি। সুখের যন্ত্রণায় আমার মুখ থেকে অস্ফুট গোঙানি বের হয়। নীরব আরো হিংস্র হয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে আমাকে তৃপ্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিভাবে আমি বেশি সুখ পাবো, কিভাবে আমি পরিতৃপ্ত হবো, সেদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি সব সময়ই। আমার কষ্ট হবে ভেবে প্রায়ই সে আমাকে ওপরে রাখে। এক সময় ক্লান্ত হয়ে দুজন জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে পড়ি। মাঝরাতে তার দাম্পত্য আদরে ঘুম ভাঙে আমার। সুখের সাগরে আবার আমরা ঝাপিয়ে পড়ি। সকালে একসঙ্গে গোসল করার সময় সে আমার বুকে, গলায়, ঠোটে ছোপ ছোপ লাল দাগ দেখে বলে, ইস! কেমন রক্ত জমা হয়ে আছে, খুব ব্যথা পেয়েছিলে বুঝি!

পাবো না, রাতে যে রকম পাগলামো করো তুমি!

ওই সময় আমার মাথা ঠিক থাকে না। তুমি আমাকে একটু হুশ করিয়ে দিতে পারো না?

তোমার ওই রকম পাগলামো আমি সব সময়ই পেতে চাই।

নীরব আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, এখন একটু পাগলামো করি!

আমি তাকে সরিয়ে দিয়ে বলি, এখন না, সারা রাত সময় পাবে। তাড়াতাড়ি গোসল সারো, অফিসে যেতে হবে না?

নীরব আমার পুরো শরীরে সাবান মেখে গোসল করিয়ে দেয়। আমিও তাকে দিই। গোসল শেষে সে আমার চুল, শরীর তোয়ালে দিয়ে মুছে দেয়, চুল আচড়ে দেয়। সে প্রতিদিন মনে করে আমাকে পিল খাওয়ায়। নীরব আমার সব চাওয়া-পাওয়া, প্রত্যাশা, স্বপ্ন, সাধ, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দেয় সর্বাধিক।

কোনো অপূর্ণতা, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, অভাব আমাকে স্পর্শ করতে দেয়নি। প্রতিটি অনুষ্ঠানে তো বটেই এছাড়া মাঝে মধ্যেই নীরব আমাকে বিভিন্ন জিনিস গিফট দেয়।

কবিতা এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতে আমার প্রচণ্ড দুর্বলতা জেনে প্রায়ই কবিতার বই কিংবা রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্যাসেট নিয়ে আসে আমার জন্য। তার একটি বড় গুণ হলো, প্রতিটি শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ, পেটিকোট কেনার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচ করে একটি করে ব্রাও কিনবে। আমি বহুদিন বলেছি, এতো ব্রা দিয়ে আমি কি করবো? কিন্তু তার নাকি খুব ভালো লাগে শাড়ির সঙ্গে ব্রা ম্যাচ করে আমাকে পরাতে। আমাদের সংসারে একটি বাটিরও যদি দরকার হয়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে আমার পছন্দ অনুযায়ী কিনবে। সংসারের কোনো জিনিস যেমন নীরব একা কেনে না, তেমনি ছোট-বড় যে কোনো কাজ বা সিদ্ধান্তও একা নেয় না কখনো। আমিও যে কোনো কাজ তাকে সঙ্গে নিয়ে এবং জানিয়েই করি। আমাদের বিয়েবার্ষিকী, ভ্যালেনটাইনস ডে, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, নববর্ষসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমিও তাকে গিফট দিই।

এক সকালে নাশতা খেয়ে উঠেই মুখে হাত চেপে দ্রুত বাথরুমে বেসিনের দিকে দৌড় দিলাম। নীরবও সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে এসে আমার অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়লো। হাত-মুখ ধুইয়ে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। সে ওই দিন অফিসে যায়নি। দুপুরের রান্নাবান্না নিজেই করেছে। আমাকে একটুও বিছানা ছেড়ে উঠতে দেয়নি। সে আমাকে যত্ন করে মুখে তুলে ভাত খাইয়ে দিল। কিন্তু খাওয়া শেষে আবারও একই অবস্থা হলো আমার। নীরব বিকেলে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার আমাকে ভালো করে দেখে এবং সবকিছু শুনে আমার অনুপস্থিতিতে নীরবকে কি যেন বললো। বাসায় এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক্তার তোমাকে কি বলেছে?

হাসি হাসি মুখে বললো, ইটস এ গ্রেট সারপ্রাইজ!

এই বলো না।

আগে চোখ বন্ধ করো। আমি চোখ বন্ধ করলে সে আমার আঙুলে সুন্দর একটি রিং পরিয়ে দিল। আমি উচ্ছ্বাসভরা চোখে বলি, বাহ। খুব সুন্দর তো! তুমি কিন্তু এখনো বলোনি- ডাক্তার তোমাকে কি বলেছেন!

তার আগে বলো, আমি এখন তোমার কাছে যা চাইবো-দেবে তো?

আমার সবকিছুই তো তোমাকে দিয়ে বসে আছি, নতুন আর কি দেবো। নীরব আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, জানো, আজ নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী এবং সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। আমি বুঝতে পেরেও তাকে বলি, কি এমন কথা যে আমাকে বলতে তুমি এতো রহস্য করছো?

কথা, আমি তোমার সন্তানের বাবা হতে যাচ্ছি।

আমি লজ্জায় তার বুকে মাথা লুকিয়ে বলি, তাহলে আমি কি হতে যাচ্ছি?

আমার কন্যার জননী।

প্রথমেই কন্যার জননী মনে হলো কেন তোমার?

তুমি দেখো। আমাদের ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে হবে। আমরা তখনই ঠিক করে রাখি আমাদের প্রথম সন্তানের নাম হবে পুষ্পিতা।

সে আমাকে আদর করতে করতে বলে, আমি যা চেয়েছিলাম, তা কিন্তু পাইনি এখনো।

আমি তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বললাম, তোমারটা তুমি বুঝে নাও।

ক্রমশই পরস্পরের রক্তস্রোত বাড়তে লাগলো। বেড়ে চললো দুটি দেহের উষ্ণতা। এক সময় দুজনে নেমে পড়লাম স্বর্গীয় সুখের খোজে।

এরপর থেকে আমার প্রতি তার সতর্কতা আরো বেড়ে গেল। বাসায় যতোক্ষণ থাকে, আমাকে কোনো কাজই করতে দেয় না। ভোরে ঘুম থেকে উঠে সকালের নাশতা তৈরি করে আমাকে আদর করে খাইয়ে দেয় যাতে দুপুরে আমার বেশি কাজ করা না লাগে।

প্রতিদিন সকালে বিছানা ছাড়ার আগে নীরব আমার পেটে কান পেতে ওর অনাগত সন্তানের হাসি শুনে আমাকে বলে, জানো, পুষ্পিতা কি বলছে? পুষ্পিতা বলছে- গুড মর্নিং আব্বু।

ইস! আমার পেটের মধ্যে থেকে তোমাকে ডাকবে! কখনো না। পুষ্পিতা বলছে– আম্মু, আই লাভ ইউ। এ নিয়ে শুরু হয় দুজনার সুখের ঝগড়া।

এক সময় নীরবই আপসে এসে বলে, পুষ্পিতা আমাদের দুজনকেই আই লাভ ইউ বলছে। বিছানা ছাড়ার আগে আমাকে আদর করতে করতে বলে, বেশিক্ষণ শুয়ে থেকো না। উঠে একটু হাটাহাটি করো, রান্নাঘরে যাবে না কিন্তু। ওই দিকটা আমিই সামলাবো। আমি এতে আপত্তি জানাই। কিন্তু কে শোনে কার কথা! অফিসে গিয়েও ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন করে আমাকে। আমি কি করছি, খেয়েছি কি না, গোসল করেছি কি না, শরীর ঠিক আছে তো, বেশি ঘুমাবে না ইত্যাদি। আমার শরীর মন ফুরফুরে রাখতে সে কি আয়োজন তার! তার এসব পাগলামিতে অস্থির হয়ে রেগে যাই মাঝে মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে তার সুন্দর মুখটি কালো মেঘে ছেয়ে যায়। আমি তাকে তখন গভীর আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে বলি, লক্ষ্মী সোনা আমার, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। তোমার সঙ্গে আর কখনো রাগ করবো না। নীরবও আমাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বলে, পাগলী আমার।

যথাসময়ে আমাদের ছোট্ট ঘরটি উজ্জ্বল করে পুষ্পিতা এলো। নীরবের ছটফটানি অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। পুষ্পিতাকে কেন্দ্র করেই আমাদের সারা দিনের উচ্ছ্বাস, আনন্দ। ছোট্ট পুষ্পিতাকে আদর করতে দেখে আমি দুষ্টুমি করে বলি, আমি বুঝি এখন গৌণই হয়ে গেলাম। পুষ্পিতাকে কোলে রেখেই এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমার জান, তোমাকে ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারি, বলো?

আমি তাকে সরিয়ে দিয়ে বলি, সরো অসভ্য, মেয়ে দেখছে তো। সে আমার ঠোটে চুমু খেয়ে বলে, তোমারটা রাতের জন্য বরাদ্দ রইলো।

এভাবে চলতে চলতে পুষ্পিতার তিন বছর হয়ে গেল। আমার মাঝে আবার আরো এক প্রাণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করলাম। আমাদের দুজনেরই প্রত্যাশা– আবারও যেন আমরা আরো একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের গর্বিত বাবা–মা হতে পারি। সে হবে আমাদের ছোট্ট মা–মণি পূর্বিতা।

পুষ্পিতা আর পূর্বিতাকে নিয়ে ভালোবাসার বন্ধনে গড়া আমাদের ছোট্ট ঘর। আমাদের ঘরে প্রাচুর্য নেই, নেই ঐশ্বর্যও। আমাদের ছোট্ট ঘরটি দাড়িয়ে আছে কেবল অগাধ ভালোবাসা, প্রবল আস্থা, পরম বিশ্বাস, অফুরন্ত শ্রদ্ধা, পারস্পরিক সহযোগিতা–সহমর্মিতা এবং নিশ্চিত নির্ভরশীলতার ওপর।

সীমাহীন ভালোবাসার মোড়কে আবদ্ধ এমন একটি স্বর্গ রচনা করতে প্রতিনিয়ত কতো কল্পনা, কতো স্বপ্ন দেখে চলছি আমরা দুজন! কতো ত্যাগ, প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা, অপমান, যন্ত্রণা, কষ্ট নীরবে, হাসিমুখে সহ্য করছি আমরা!

জানি না, এ নিষ্ঠুর পৃথিবীতে এ রকম একটি স্বর্গ রচনা করতে আমরা পারবো কি না। নীরবের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি নেই। সমস্যা হলো আমার পরিবার। আমার পরিবার কিছুতেই নীরবকে মেনে নেবে না জানি। তারপরও আশায় বুক বেধে আছি, দুটি হৃদয়ের টুকরো ভালোবাসা, খণ্ড স্বপ্ন আর ছেড়া যন্ত্রণাগুলো জমা হয়ে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার খামারবাড়িটি।

ঠিকানা বিহীন

অন্ধ প্রেম

মঞ্জু রায়

আজব কিংবা মহৎ নাকি অন্ধ নামে অভিহিত করবো ভেবে উঠতে পারছি না। তাই দায়িত্বটা যায়যায়দিনের পাঠকের হাতেই রইলো –

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, প্রেম তার নাম।।

মানুষ প্রেমে পড়ে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ নেই যার নারীর প্রতি আলাদা টান নেই। যদিও বালজাক বলেছিলেন, উৎকৃষ্ট পুরুষের জীবন হচ্ছে খ্যাতি, আর নারীর জীবন হচ্ছে প্রেম। তবুও আমার মনে হয় নারীর প্রতি পুরুষের এ টান দোষের নয়, আবেগের।

একজন পুরুষ হিসেবে আমার প্রেমে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু যেসব মেয়েকে চিনি, জানি এবং স্কুল কলেজে যাদের সাহচর্য পেয়েছি তাদের কারো কাছ থেকে এ ধরনের আগ্রহ টের পাইনি। হয়তো কারো মনের অন্তরালে লুকিয়ে ছিল এমন অনুভূতি যা ভয়, লজ্জা সংকোচ কিংবা অন্য কোনো কারণে কেউ তা ব্যক্ত করেনি। নয়তো আমি টের পাইনি।

তাছাড়া জানতাম প্রেমিক–প্রেমিকার জীবন আগ্নেয়গিরির চূড়ায় কম্পমান, যে কোনো সময় ধসে যাবে। তাই জেনে শুনে আমার সঙ্গে অন্যের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে চাইনি। এ জন্য হয়তো কারো প্রেমিক না হতে পেরে কোনো আক্ষেপ ছিল না। কারণ প্রেম হলো মানবিক আবেগের শুদ্ধ রূপ। কিন্তু আমরা যে প্রেম দেখে আসছি তা খুবই অশুদ্ধতায় পরিপূর্ণ। তাই কারো কারো প্রেম অনুভূতি দেখে কিছুটা ঈর্ষান্বিত হলেও এসব ভেবে সহজেই থেমে যেতাম।

এসবের পরেও আমার জীবনে প্রেম আসেনি এমন নয়, তবে যে প্রেমে নিজেকে জড়িয়েছি তা স্বাভাবিক কিংবা অন্য দশজনের মতো নয়। বলতে গেলে অস্বাভাবিক, কিছুটা অদ্ভুতও বটে। চাকরির সুবাদে পরিচিত হই ভিন্ন জেলার মানুষের সঙ্গে। এরই মাঝে এক মহৎ ব্যক্তি আমাকে জড়িয়েছেন তার সঙ্গে। ওই ব্যক্তির মাধ্যমেই ঠিকানা সংগ্রহ করে গায়ে পড়ে একটি চিঠি লিখি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘ এক বছর আমার লেখার কোনো জবাব নেই। এটার ভবিষ্যৎ সহজেই অনুমেয়। কিন্তু না, যা অনুমান করেছি তা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। এক বছর পর তার একটি চিঠি পেলাম, তিনি লিখেছেন... মি. আপনি যে ব্যাপারে আমাকে লিখেছেন তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সামনের মাসে আমার অনার্স প্রথম বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা, আশীর্বাদ করবেন।

আমি আবারও অনধিকার চর্চা করে বন্ধু হিসেবে আমার আশীর্বাদ বার্তা পাঠাই এবং শেষ উক্তি হিসেবে লিখি *গুডবাই বাট নট ফর এভার*। আর ধরে নিলাম কোনো সুদর্শন যুবকের সঙ্গে তার প্রেমলীলা হয়তো তখন তুঙ্গে। তাই আর বাড়াবাড়ি না করে নিজেকে লুকিয়ে রাখি নিজেরই মাঝে। অপ্রত্যাশিত হলেও সত্য ছয় সাত মাস পর তিনি আমাকে লিখেছেন মি. আপনার চিঠি পাওয়ার পর থেকে কেন জানি আপনাকে বার বার মনে পড়ে। বলতে পারেন ভয় কিংবা লজ্জায় তখন তা প্রকাশ করতে পারিনি। এ মুহূর্তে আপনার অনুভূতি কি?

আমি তাকে প্রেমিকা হিসেবে লিখিনি তবুও তাকে কিছুটা আকৃষ্ট করার জন্য লিখলাম, আমাকে কেমন বন্ধু হিসেবে পেতে চান? আপনি চাইলে সব কিছুই সম্ভব। হয়তো এটুকুই ছিল আমার অপরাধ।

বিনিময়ে তিনি লিখেছেন, আরে মি. আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে টিয়ে সম্ভব নয়, আমার বাবা আপনাকে চেনেন না জানেন না, তাদের মেয়েকে কি আপনার কাছে দেবে?

অবশ্যই সঠিক, তাই ধরে নিলাম তার বাবা–মা তাদের *ললনার* পছন্দশীল একজন সুদর্শন ছেলেকে পুষছেন যে তাকে বিয়ে করে ইয়ে হবে। তাই তাকে বিয়ে করে ওই পোষ্য ব্যক্তিটাকে এতিম বানাতে রাজি হইনি। এ জন্যই আমি তাকে বন্ধুর মতো লিখতে শুরু করি, তেমনি সেও। কিন্তু আমার গোটাকতক চিঠির পরেই তিনি লিখেছেন, আজ মহা শূন্যে দাড়িয়ে বলতে পারি আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি।

দেখুন কি মুশকিল! আমাকে আবার দায়িত্ব দিয়েছে তার ভালোবাসা পরিমাপ করার জন্য। কি আর করা, ভালোবাসা পরিমাপ করা যায় এমন কোনো যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তাই বিধি প্রদত্ত মন দিয়েই অনুভব করতে শুরু করলাম সে কি আমায় ভালোবাসে? এবং তা কি সত্যিই? তরুণী পুরুষের ভালোবাসা চায়, চায় অনুরাগ কিন্তু ধরা পড়তে চায় না। এসব জানা সত্ত্বেও নিজেকে সামলে নিতে পারিনি। তাকে লিখতে শুরু করি প্রেমিকার মতো তেমনি সেও। এ প্রেম বছর দুয়েক গড়িয়ে চলেছে। মুখে মুখে সে আমায় অনেক ভালোবাসে কিন্তু বাস্তবে মনে হয় তা খুব নগণ্য।

একটা কথা আছে, অবিশ্বাসের মধ্যে প্রেম কিংবা বন্ধুত্ব কিছুই স্থায়ী হয় না। হয়তো সে চিরাচরিত নারী স্বভাবের প্রভাবেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

তাই মনে হয় দুজনের মাঝে প্রায়ই নেমে আসে অন্ধকার। অবশ্য এ জন্য আমার দায়ভার একেবারে কম নয়। তাছাড়া তাকে দূরে ঠেলে দেয়া কিংবা পরীক্ষার জন্য মাঝে মধ্যে এমন করি তা নয়, শুধু চেয়েছি তাকে নিজের মতো গড়ে নিতে। তবে মনে হয় আমি ব্যর্থ। দিন দিন জড়িয়ে ফেলেছি নিজেকে ব্যর্থতার বেড়াজালে। মনে হয় কিছু লেখক এ জন্যই নারীর মনকে বর্ষার আকাশের রঙের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তার মন কখনো মোড় নেয় আমার দিকে কখনো তার বাবা–মায়ের দিকে। যদিও কখনো তাকে বলিনি তার বাবা–মাকে ত্যাগ করে আমার কাছে চলে আসতে। তার মতে কুড়িগ্রাম টু সিলেট এতো দূরে স্বাভাবিক উপায়ে আমাদের শুভ পরিণয় সম্ভব নয়। যেহেতু তার জানা নেই দ্রুতগামী যান আবিষ্কারের ফলে দূর আজ আর দূর নয়। তাই হয়তো সে আমার কথা চিন্তা করলে নিজেকে বাবা–মায়ের থেকে চিরবঞ্চিত ভাবে। এ সব শুধু তারই সিদ্ধান্ত। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুরুষ হিসেবে আমাকে কোনো পিছুটান ফেরাতে পারবে না। কিন্তু তিনি যেমনি বাবা–মায়ের আদরের *ললনা* আমি তেমনি বাবা–মায়ের আদরের সন্তান। আমার বাবা–মাকে দীর্ঘদিন ধরে জানি, আমি উপার্জনশীল কিংবা তাকে আকাশের চাদ পেয়ে ধরে এনেছি এ জন্য মেনে নেবেন এমন নয়। তবে অতিরিক্ত স্নেহের আধিক্যে হয়তো সন্তান হিসেবে আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন। এই সাহসে উৎসাহী হয়ে তাকে বার বার কাছে টানতে চাই। কিন্তু সে তো *নারী* তাই–

পুরুষ যদি তাদের সাহায্য না করে, ভাববে নীতি নেই যদি তা করে ভাবে মেয়েদের প্রলোভিত করার একটা কৌশল।

এসব ভেবে তাকে কোনো পথ দেখানো কিংবা কোনো প্রস্তাব দিতে চাই না। কিন্তু দিনের পর দিন তিল তিল করে মনের অজান্তে যে ভালোবাসা লালন করেছি তা কিভাবে সংবরণ করি।

একটা প্রবাদ আছে–

যখন চাদ উঠে সঙ্গে মশাল নিও না
তাহলে চাদের হৃদয় ভেঙে যাবে
যদি তুমি প্রতিশ্রুত থাকো, একটি মেয়ের কাছে
অন্য কারো কাছে যেও না, তাহলে মেয়েটির
হৃদয় ভেঙে যাবে।

যদিও কোনো দিন তাকে দেখিনি, তবুও হৃদয় ভাঙার অপরাধে আমি অপরাধী হতে চাই না। *প্রচণ্ড সুন্দরী কাউকে দূর থেকে অনুভব করা নিরাপদ* ভেবে তার কাছে যাচ্ছি না এমন নয়। তবে তার সৎ ইচ্ছা টের পেলেই যে কোনো সময় তার কাছে যেতে পারি। কিন্তু মাঝে মধ্যে তার কিছু অনাগ্রহ, আমাকে আমার অনুভূতিগুলোকে ভোতা করে দেয়। মন চায় ফিরে যাই আমার অতীতে। কিন্তু তা কি সম্ভব?

নারী কণ্ঠের কাতর আহ্বান মুনি ঋষিরাও উপেক্ষা করতে পারে না আমি তো মাত্র বদ্ধজীব। তাই নিজের অর্জিত টাকার বিনিময়ে মোবাইল কম্পানিকে দিচ্ছি হাজার হাজার টাকা মাসোয়ারা।

নারী এমন এক প্রজাতি যাদের সহজে বশে আনা যায় না। আমিও তাকে আমার বশে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করি না। আমি যা চাই তা হচ্ছে তাকে, শুধু তাকেই নিজের করে পাওয়া। কিন্তু কতোটুকু সম্ভব? এক পা এগিয়ে গেলে তিনি যান দুই পা পিছিয়ে তবুও নিজেকে ফিরিয়ে আনতে পারছি না। শুধু চেয়ে আছি তারই দিকে, আর উপলব্ধি করছি। ভালোবাসা দৈহিক অনুভূতি নয়, আত্মিক অনুভূতি বলেই একটি অপরিচিত মেয়েকে এভাবে ভালোবেসে নিজেই প্রতারিত কিংবা সার্থক হতে চলেছি।

সিলেট থেকে

ট্রেন ও বন্ধু

মতিউর

ট্রেনের সিটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্বতীপুর স্টেশনে চড়লাম একতা এক্সপ্রেসে। যাওয়ার স্থান খোলাহাটি অর্থাৎ ক্যান্ট কলেজে। তিনজনই ক্যান্ট কলেজে পড়ি। ফৃতে ট্রেনে আসতে পারি বলে কয়েক বন্ধু মিলে প্রায়ই পার্বতীপুরে আসি। এমনকি সামান্য খরচ খাতা কলমের জন্যও পার্বতীপুরে আসি। খোলাহাটি অর্থাৎ আমাদের কলেজ থেকে পার্বতীপুর প্রায় ৮ কিলোমিটার। অন্য ট্রেনে তেমন সমস্যা না হলেও আন্তঃনগর ট্রেনে কিছু সমস্যা হয় টিকেটের জন্য। ট্রেনে চড়েই চিন্তা করলাম যেভাবে হোক পার পেতে হবে।

ট্রেন কিছু দূর যাওয়ার পর আমাদের ক্যাবিনে এক টিটি এসেই বললো, দেখি আপনাদের টিকেট।

সেলিম বললো, আমরা খোলাহাটিতে যাবো। খোলাহাটি যাবে, ভাড়া লাগবে না? রাগতস্বরে টিটি বললো। আমাদের ভাড়া না দেয়ার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করি। অস্ত্রটি হচ্ছে ছাত্রের পরিচয়।

এতে টিটি আঙ্কল আরো রেগে বললো, ছাত্র তো প্রেসিডেন্ট নয় যে ফৃ নিয়ে যাবো।

কথাটি যদিও ভুল ছিল কারণ প্রেসিডেন্টও ভাড়া দিয়ে ভ্রমণ করেন। শেষে ভাবলাম ঘুস দেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। পাচ টাকা বের করে টিটি আঙ্কলকে দিয়ে বললাম, আঙ্কল এখান থেকে খোলাহাটির টিকেটের মূল্য ২০ টাকা, এতো টাকা দিয়ে টিকেট কাটবো নাকি!

নিয়ম যা তা তো মানতে হবে বিনয়ের সুরে বললো টিটি। টিটি চলে যাওয়ার পর বন্ধু ফারুক বললো, দেখ মতিউর, এ টাকার শোধ অবশ্যই নেবো।

যদিও বন্ধুরা সবাই ফারুককে জানি। যে কোনো জটিল কাজ তার কাছে তুচ্ছ। অবশেষে বললাম, কিভাবে? সে বললো, দেখলেই বুঝতে পারবি। ৪ মিনিট পর খোলাহাটি আসবো এমন সময় ফারুক উঠে গেল এবং কিছুক্ষণ পর তিনটা কেক নিয়ে এলো। তিনজনেই কেক খেলাম। এরপর খাবার দেয়া লোকটা টাকা নেয়ার জন্য আসতেই বন্ধু ফারুক বললো, তিনটা চা নিয়ে আসেন।

ততোক্ষণে ট্রেন খোলাহাটিতে। আমাদের দুজনকে ফারুক হাত ধরে নামিয়ে দিয়েছে। কেকের টাকার কথা বলতেই বললো, শালা টাকা তো এভাবেই শোধ নিলাম। তখন আমরা দুজনে হাসতে হাসতে খুন। আজ ফারুক কোথায় আর আমি কোথায়! তার কথা মনে পড়লেই এ ঘটনা মনে পড়ে যায়। যদিও আমাদের এটি করা ঠিক হয়নি।

বাবরীঝাড়, নীলফামারী থেকে

চেনা

নোভা

অচেনা মানুষদের স্মৃতি আমার ভেতর জাগিয়ে তোলে কৈশোরের নিষ্পাপ ভালোবাসার কথা, যাকে ইউটোপিয়ান লাভ বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না।

দশ বছর বয়সে কাউকে ভালো লাগতে শুরু করলে সেটাকে প্রেম বলা যায় না। ভালোবাসার অর্থ কি, মানুষ কেন ভালোবাসে এসব তখন জানতাম না। যাকে ভালো লাগতো সে আমার কাজিন। সে ছিল দারুণ স্মার্ট, অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলতে জানা, স্পোর্টসম্যান। সে প্রথম বিভাগে খেলতো, বিদেশেও যেতো। ছিল প্রচণ্ড উচ্ছল একজন মানুষ। তার মনের সত্য কথার নাগাল পেতাম না। কখনো মনে হতো আমাকে খুব পছন্দ করে, কখনো মনে হতো তেমন একটা না।

আমাদের বয়স বাড়তে লাগলো। নিঃশব্দে মুগ্ধ হয়ে দেখতাম, কথা শুনতাম, তার হাতের লেখা ছোটখাটো কাগজগুলো রেখে দিতাম। কোন পোশাকটি পরে করে আমাদের বাসায় এসেছে তা দিন–তারিখসহ লিখে রাখতাম। এক বিস্ময়কর ঘোর লাগা সময়।

আমাকে বলেছিল, আমার স্কুলের সামনে দিয়ে সে একদিন যট্র (অতিক্রম) করেছিল। স্কুলের সামনের রাস্তা তার যাতায়াতের পথ নয়। এ কথা শোনার পর থেকে বাকি স্কুল জীবন বছরের পর বছর আমি টিফিন ব্রেকে মাঠের সেই জায়গায় দাড়িয়ে থাকতাম, যেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। মনে হতো কোনোদিন যদি সে আবার এ পথ দিয়ে যায়। বিয়ের আগ পর্যন্ত ঈদের দিন সকালবেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বারান্দায় দাড়িয়ে তার অপেক্ষা করতাম। সে যখন আসতো, আমি বলতাম, আমি আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। সে বিশ্বাস করতো না।

আমার সেই ভালোবাসার কোনো প্রতিদান পাইনি। পবিত্রতা রক্ষা করে অন্তঃকরণ উজাড় করে আমি ভালোবেসেছিলাম, এটাই আমার তৃপ্তি।

দেহসর্বস্ব ভালোবাসাকে আমার ভালোবাসা মনে হয় না। যে প্রেম দৈনন্দিনতার আবহে পড়ে পিষ্ট হয়নি, সেই প্রেম তার মাধুর্য হারায়নি। তার সঙ্গে আমার জীবন যাপন হয়নি। সে এখনো আমার কাছে মোহময়, চিরতরুণ। তার কোনো কদর্য রূপ দেখিনি। সে আমার কল্পনার জগৎ। আমার সুউচ্চ এপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে আমি প্রকৃতির দিকে চোখ রেখে মাঝে মধ্যে সে জগতে হারিয়ে যাই। যার সঙ্গে জীবন যাপন করছি, তার ভালোমন্দ সবই আমার জানা হয়ে গেছে। কিন্তু যাকে ভালোবাসতাম সে আমার কাছে ধডমভ– আমার ভালো লাগা এবং মোহের জগৎ।

অনেক দিন পর তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সে বললো, রাস্তাঘাটে দেখলে তো আমাকে চিনবে না।

বললাম, একশ বছর পর দেখলেও আপনাকে চিনতে আমার কখনো ভুল হবে না।

সে কি বুঝতে পারলো, এখনো আমার অন্তরের কোথায় সে বাস করে?

গুলশান, ঢাকা থেকে

অনুশোচনা

২০০৪ সালে আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে যাই। মাত্র চার সপ্তাহ সেখানে ছিলাম। এ চার সপ্তাহ আমার কাছে মাত্র চার দিন মনে হয়েছে। বাংলাদেশের সব কিছুই আমার কাছে অসাধারণ সুন্দর মনে হয়েছে। তাই এক সময় সিদ্ধান্ত নিলাম স্থায়ীভাবে সেখানে থেকে যাবো।

পরিবারের চাপে সিদ্ধান্ত বদল করে চার সপ্তাহের মধ্যেই ইউএসএ–তে ব্যাক করি। ফিরে আসার পরে প্রচণ্ড মন খারাপ লাগে, শুধু দেশের কথা মনে পড়ে। এমনি একদিন প্রচণ্ড মন খারাপ নিয়ে অনলাইনে বসে যায়যায়দিন–এ প্রবাসী সংখ্যা পড়ছিলাম। অসংখ্য লেখার মাঝে অমৃতা নামের একটি লেখা আমার কাছে খুব ভালো লাগে।

অমৃতা গল্পের কাহিনী ছিল এমন– গল্পের লেখক, ধরা যাক তার নাম মি. মিশকাত। যখন তিনি বুয়েটের স্টুডেন্ট ছিলেন তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়া অমৃতা নামের মেয়েটির সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এ বন্ধুত্ব এক সময় ভালোবাসায় রূপ নিলেও তারা দুজন কেউ কারো কাছে সে ভালোবাসা প্রকাশ করেনি। ফলে সময়ের স্রোতে এক সময় অমৃতা বিয়ে করে লন্ডন প্রবাসী হয়।

অমৃতার বিয়ের পর মিশকাত বুঝতে পারে সে কি হারিয়েছে, কি ভুল করেছে। তখন আর করার কিছুই নেই। প্রচণ্ড ভালোবাসার কারণে তিনি আজও ভুলতে পারেনি অমৃতাকে বরং এই উনিশ বিশ বছর ধরে বয়ে বেড়াচ্ছেন তার না বলা ভালোবাসার কষ্ট। সেই না বলা ভালোবাসার চমৎকার সৃষ্টি এই অমৃতা।

অমৃতার কাহিনী আমাকে কেমন যেন নষ্টালজিক করে তোলে। বুয়েট শব্দটিও কেমন যেন নাড়া দেয় আমার মাঝে। মনে পড়ে পেছনে ফেলে আসা কিছু ঘটনা– যা ঘুরেফিরে নিজের অজান্তেই মনে এসে নাড়া দেয় অনবরত।

সেই ১৯৯৭ সালের কথা। সে সময় বাংলাদেশে যাচ্ছিলাম বিয়ে করার জন্য একান্ত আমার মায়ের ইচ্ছায়। লম্বা পথ পাড়ি দিচ্ছি প্লেনে। যাত্রাপথে হঠাৎ চোখে পড়লো আমার আর আম্মির পাশে বসে থাকা ইয়ং ছেলেটিকে। মনোযোগ দিয়ে তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় বই ূধডদমফট্র ওযটরপ্র–এর কদণ ূর্মণঠমমপ পড়ছেন। ভাবলাম হয়তো কোনো স্প্যানিশ ছেলে হবে। নিশ্চয় লন্ডন বা জার্মানিতে নেমে যাবেন। বার বার ছেলেটির হাতের বইয়ের দিকে তাকাচ্ছি এবং ভাবছি যদি এ বইটা পেতাম তাহলে এই লম্বা ভ্রমণটা সত্যিই ছোট হয়ে যেতো আমার কাছে। কিন্তু কি আর করা, কোনো উপায় নেই! পাশে দেখি আম্মি ঘুমাচ্ছেন। তাই আমিও গায়ে কম্বল জড়িয়ে ঘুমের প্রস্তুতি নিলাম। ঠিক এমন সময় আমাকে পুরোপুরি অবাক করে দিয়ে তিনি পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন, আমি এখন ম্যাগাজিন পড়বো, চাইলে আপনি বইটি পড়তে পারেন।

তার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লাম। তিনি যে বাঙালি তা চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই।

যাহোক, সেই বই নেয়ার সূত্র ধরেই পরিচয় হলো আর পরিচয় সূত্রে জানলাম তার নাম রাহাত। তিনি আমেরিকার সিয়াটলে থাকেন। সেখানে তিনি সিয়াটল আইটি ইউনিভার্সিটিতে কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এ পিএইচডি করছেন। রাহাত তিন সপ্তাহের জন্য ঢাকায় যাচ্ছেন তার ছোট বোনের বিয়েতে। গল্পে গল্পে সারাটা আকাশ পথ পাড়ি দেয়ার পর আমরা ঠিকানা ও ফোন নাম্বার বিনিময় করে এয়ারপোর্ট থেকে বাড়িতে গেলাম। রাহাত ছিল তাদের ফার্মগেটের ইন্দিরা রোডের বাসায় এবং আমি উত্তরার তিন নম্বরে।

হোক, ঢাকায় অবস্থানের সময় প্রতিদিন রাহাত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতো। আমাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতো আর পুরনো পড়ার জায়গা বুয়েটের এ মাথা থেকে ওই মাথা সব জায়গা ঘুরে দেখাতো। রাহাত এক সময় বুয়েটের খুব নামকরা ছাত্র ছিল। এ জন্য দেখলাম বেশির ভাগ টিচার তাকে খুব ভালোভাবে চেনেন। অন্যদিকে যখন বিয়ের উদ্দেশে বিভিন্ন জায়গায় পাত্র দেখতে যেতাম তখন রাহাতও মহা উৎসাহে আমার সঙ্গে পাত্র দেখায় শামিল হতো এবং সবশেষে পাত্রের একটা খুত বের করে ফিরে আসতো। তার এ আচরণে খুব মজা পেতাম।

তবে মজা খুব বেশি দিন স্থায়ী হলো না। হঠাৎ আম্মি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিয়ে–শাদির ব্যবস্থা বন্ধ রেখে আম্মিকে নিয়ে অতি দ্রুত ইউএসএ ফিরে আসি। রাহাত থেকে যায় আরও দুই সপ্তাহ। আমার সুস্থ সবল মধ্যবয়সী আম্মির শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়ে। আমার চাকরি, পড়াশোনা ফেলে আম্মির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করি। ভুলে যাই চিরচেনা পরিবেশ। ডেটন হসপিটাল হয়ে যায় আমার সব কিছু।

ইতিমধ্যে রাহাত ফিরে আসে সিয়াটলে। আম্মির খবর শুনে সে হাজার মাইল পথ পেরিয়ে ডেটন শহরে আসে। আমাকে সান্ত্বনা দেয়। সিয়াটলে ফিরে গিয়েও শত ব্যস্ততার মাঝে নিয়মিত ফোন করে যোগাযোগ রাখে। আম্মির অসুস্থতায় রাহাতের চমৎকার আচরণ, দায়িত্বশীলতা আমাদের মাঝে গভীর বন্ধুত্বের সূচনা করে। তাকে একজন ভালো বন্ধু হিসেবে ধরে নিই।

সময়ের পরিক্রমায় একদিন আম্মি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। আম্মির মৃত্যুতে চারপাশের পৃথিবী এলোমেলো হয়ে যায়। মানসিক দিক দিয়ে ভীষণ ভেঙে পড়ি। তবে নতুন করে কাজে যোগ দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া শুরু করি। অন্যদিকে রাহাত পিএইচডি শেষ করে হাজার মাইলের দূরত্ব কমিয়ে আমার শহরের পাশের স্টেট ক্যান্টাকিতে মুভ করে। নর্দার্ন ক্যান্টাকি ইউনিভার্সিটিতে টিচার হিসেবে জয়েন করে। প্রতি সপ্তাহে সে আমার শহর ডেটন–এ আসতো, আমার মন ভালো করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাতো। সব সময় লক্ষ্য করতাম সে কি যেন একটা বলার চেষ্টা করছে। তবে চুপ থাকতাম।

ইতিমধ্যে তিন মাসের জন্য সে ইওরোপিয়ান কিছু দেশে চলে যায় সেমিনারে। যোগাযোগ কিছুটা কমে যায়। পরিবারের সবার পছন্দে আমার ইচ্ছায় সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র রিসাতের সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট হয়। ফোনে আমার সুখবর দিই রাহাতকে।

রাহাত তখন যেন এক প্রচণ্ড ধাক্কা মেশানো কণ্ঠে শুধু বলে, মার্শা, তোমার এ খবরের জন্যই কি সুদূর সিয়াটল থেকে ক্যান্টাকিতে এসেছি? কিভাবে তুমি পারলে আমাকে এতো কষ্ট দিতে! রাহাতের এ কথায় আমার পৃথিবী নড়ে ওঠে। বুঝতে পারি কি ভুল করেছি। না বলা ভালোবাসার কথা বুঝতে না পারার কষ্ট নিয়ে জীবনের সব দুঃখ এক করে শাওয়ারের নিচে দাড়িয়ে চিৎকার করে কাদতে থাকি। যখন বুঝতে পারি পেছনে ফিরে তাকানোর কোনো উপায় নেই তখন রিসাতের হাত ধরে নতুন জীবনে প্রবেশ করি।

জীবনের প্রচণ্ড পূর্ণতার মাঝে রাহাত নামের বিশাল এক অপূর্ণতা আজো আমাকে কষ্ট দেয়। পাঠকরা লক্ষ্য করবেন, অমৃতার সেই লেখক মিশকাতের সঙ্গে আমার এ ঘটনার কোথায় যেন ক্ষুদ্র একটা মিল রয়েছে। এ মিল থেকেই মিশকাতের জন্য সূক্ষ্ম সহানুভূতি অনুভব করে তাকে একটা ই-মেইল করি। লেখক মিশকাত আমার ই-মেইলের প্রতিউত্তর দেন। এভাবে দিনের পর দিন ই-মেইলে তার সঙ্গে আমার পরিচিতি গড়ে ওঠে।

মিস্টার মিশকাত ছিলেন ঢাকার একজন নব্য শিল্পপতি। একদিন তিনি জানালেন ব্যবসার প্রয়োজনে ইওরোপ-আমেরিকা টুরে আসছেন। তিনি ওয়াশিংটনে আসবেন। জানতে চাইলেন আমার সম্ভব হবে কিনা তার সঙ্গে দেখা করার।

সানন্দে রাজি হই। কারণ আমি নিউ জার্সিতে বসবাস করলেও আমার কম্পানির হেড অফিস ওয়াশিংটন ডিসিতে। কম্পানির প্রয়োজনে প্রায়ই আমাকে ওয়াশিংটন ডিসিতে যেতে হয়। যে সময় তিনি আসবেন ওই সময় ৪ জুলাই পড়েছে। তিনি জানালেন, তিনি ২ থেকে ৭ জুলাই ওয়াশিংটন ডিসিতে থাকবেন। কিন্তু মনে আমার আর এক ধরনের আশঙ্কাও কাজ করছে। কারণ ৪ জুলাই ছুটি হলে বাকি দুই/তিন দিন ছুটি পাওয়া আমার জন্য কঠিন। কারণ আমাদের ইউনিটের চিফ সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজার, চিফ অ্যানালিস্ট সবাই ইতিমধ্যে ছুটিতে গেছেন। এদিকে নতুন নতুন সফটওয়্যারের অর্ডার টেবিলে চলে এসেছে। তাই নিজের ছুটি বাগাতে হাতের সব ফাইল দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করলাম। এমনকি বসকে খুশি করানোর জন্য কিছু সফটওয়্যারের মডিউল পর্যন্ত করে রাখলাম যা আমার দায়িত্বের মধ্যে আসে না। বান্ধবী এবং সহকর্মী লিন্ডা আর সামান্থার সাহসে ভর করে বসের কাছে পুরো এক সপ্তাহের ছুটি চাইলাম। বস দেখবেন বলে বিদায় দিলেন।

এদিকে লেখক ১৯ জুন লন্ডন এসে পৌছান। আমার সঙ্গে তার ফোনে কথা হয়। এরপর তিনি জার্মানি যান। সেখান থেকে তিনি আমাকে ফোন করেন। বলেন জার্মানির এক ছোট্ট শহরের একটি ফ্যামিলি কটেজে রয়েছেন - যার পরিবেশ অসাধারণ সুন্দর এবং ট্রাডিশনাল। লেখকের চমৎকার বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে আমিও কল্পনায় ভর করে যেন চলে গেলাম সেখানে।

অবশেষে ছুটি পেলাম। আমাদের আগে থেকে প্ল্যান ছিল ৪ জুলাই ছুটি কাটাবো মেরিল্যান্ড-এ আমার শ্বশুরের বাসায়। রিসাতকে বললাম, অফিসের কাজে মেরিল্যান্ড থেকে দুদিনের জন্য ওয়াশিংটন ডিসিতে যাবো। ওয়াশিংটন ডিসি, মেরিল্যান্ড ও ভার্জিনিয়া- তিনটা স্টেট একদম কাছাকাছি। একটি স্টেট থেকে অন্যটির দূরত্ব মাত্র দুই তিন ঘণ্টার ড্রাইভ। ভার্জিনিয়ায় রিসাতের বোন থাকে। তাই সেখানে অবস্থান করে লেখকের সঙ্গে দেখা করা কিছুটা অন্য রকম। আমার অফিসের ডাবল ট্রি হোটেলে রুম বুকিং দিলাম। লেখকের সঙ্গে ফাইনাল কথা হলো সোমবার ৫ জুলাই। লেখকের সঙ্গে দেখা করবো। ঠিক করলাম সেদিন সন্ধ্যা ৬টায় তার বন্ধুর বাসা থেকে তাকে তুলবো, ডিনার খাবো এবং রাতে লং ড্রাইভে ঘুরে তার বন্ধুর বাসায় নামিয়ে হোটেলে ফিরে আসবো। শুক্রবার ২ জুলাই মেরিল্যান্ড-এর উদ্দেশে রওনা দিলাম। মনে মনে কিছুটা উত্তেজিত আমি। মনে হয় স্পেস শাটলের গতিতে হাইওয়েতে ছুটে চলছে আমার

লেকসাস। অৃডৌ এ বাজছে ফিল কলিন্সের সেই বিখ্যাত গান– ুটঢণ বণ ঠণফধণশণ ´দর্ট ´রলণ ষধ্রদ ডটর্ভ ঠণ ঢণভধণঢ।

মেরিল্যান্ড পৌছে লেখককে ফোন করলাম তার বন্ধুর বাসায় এবং লেখকের একটা ই–মেইল পেলাম। বুঝলাম মিশকাত এসে পৌছেছেন। তাই আবার ফোনে মেসেজ রাখলাম।

মেরিল্যান্ডে চমৎকার সময় কাটলো। রাতে খাবার টেবিলে রিসাত বললো, মাম্মি চলো মার্শার সঙ্গে ভার্জিনিয়া যাই। কাল সে একা এতো দূর যাবে! তারচেয়ে বরং ওয়াশিংটন ডিসিতে অফিসের কাজ সারবে, আমরা আপার বাসায় ভার্জিনিয়াতে সময় কাটাবো। স্বাভাবিকভাবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ রিসাতরা সঙ্গে গেলে আমাকেও তার বোনের বাসায় থাকতে হবে। হোটেলে থাকতে পারবো না। কি আর করা অযাচিত ঝামেলা।

পরিস্থিতি বুঝে সব ঠিক করবো এ চিন্তা করে সোমবার ৫ জুলাই সবার সঙ্গে সকালে ভার্জিনিয়া পৌছালাম। লেখককে বার বার ফোন করছি, পাচ্ছি না। মেসেজ রাখছি যদি কোনোভাবে তিনি ই–মেইল করেন, এ আশায়। দুপুরে তার ই–মেইল পেলাম। লিখেছেন, হঠাৎ করে তার পার্টি পড়ে গেছে সন্ধ্যা ছয়টায়, তাই আমি যেন তাকে পারলে রাত নয়টায় পিকআপ করি।

প্রচণ্ড রাগ হলো মনে। কষ্টও হচ্ছিল, ঠিক করলাম সব কিছু ফাইনাল করার পর এখন তিনি সময় চেঞ্জ করছেন। থাক, কারো সঙ্গে দেখাই করবো না। জানালায় তাকিয়ে দেখি প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আমার মনের বৃষ্টি আর প্রকৃতির বৃষ্টি তখন একাকার। প্রচণ্ড বিব্রত বোধ করলাম। মনের কষ্ট লুকানোর জন্য শপিং মলে গেলাম। মজার ব্যাপার, পরে জানলাম যে সময় আমি টাইসন মলে শপিং করছিলাম, মিশকাতও তখন সেখানে ছিল কাকতালীয়ভাবে। কিন্তু কেন যেন দেখা হয়নি ওখানে। শপিং শেষে হোটেলে বুকিং ক্যানসেল করে বান্ধবীর অ্যাশবার্নের বাসায় গেলাম।

রাতে বাসায় ফিরে আবারও কোনো এক ভাবনায় ই–মেইল চেক করলাম। না, কোনো মেইল পেলাম না তার। বিষণ্ন মন নিয়ে ঘুমাতে গেলাম। কারণ সকালে নিউ জার্সিতে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিতে হবে। সারা রাত কেন যেন রাহাতকে স্বপ্নে দেখলাম।

২০০২–২০০৩–এ দুবার ডেটনে বেড়াতে গেছি। অনিচ্ছাকৃতভাবে এক পার্টিতে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার দিকে তার তাকানোর দৃষ্টি ছিল কেমন যেন বিষণ্ন একাকার। তার গম্ভীরভাবে বলা উদাসীন কথাবার্তা শুনে প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছিল আমার। কেন যেন মনে হয়েছিল সে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রাহাত।

একজন সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ হয়েও এ আটত্রিশ বছর বয়সেও বিয়ে করেনি। অনেক অনুরোধ করেছি। আমার অনুরোধ জানি সে সারা জীবন উপেক্ষা করবে আমাকে মানসিক শাস্তি দেয়ার জন্য। এ কেমন শাস্তি জানি না। এ–ও জানি না আমার এ লেখা প্রকাশিত হবে কি না বা প্রকাশ হলে সেটা আদৌ রাহাতের চোখে পড়বে কি না। তবে পড় ক আর না–ইবা পড় ক, আজ সব ইচ্ছা একত্র করে ক্ষমা চাইবো রাহাতের কাছে আমার সত্যিকার অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য। কিন্তু জীবনের এ প্রান্তে দাড়িয়ে আমার পক্ষে অনুশোচনা করা ছাড়া কিছুই করার নেই। এতোটুকু অন্তত সে বুঝবে, সেটাই চাইবো।

মঙ্গলবার ৬ জুলাই নিউ জার্সির পথে রওনা দিলাম। রিসাত বলছে, মার্শা, আসার সময় আমি ড্রাইভার হয়েছিলাম, এবার তুমি ড্রাইভার হবে যাওয়ার পথে। তার কথার কোনো উত্তর দিলাম না। শান্ত মনে ব্যাক সিটে গিয়ে বসলাম। পুরো রাস্তা আমি চুপচাপ। আমার বিষণ্নতা দেখে রিসাত বলে উঠলো, সারা জীবন তোমার পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটিয়েছো। শুধু একটা ছুটি আমার পরিবারের সঙ্গে কাটালে বলে তোমার মনটা এতো খারাপ হলো। তোমরা মেয়েরা ভীষণ মিন। তার ভুল বোঝার মাত্রা দেখে আমার চোখ দিয়ে গরম জল ঝরতে লাগলো।

দুপুর বারোটায় নিউ জার্সিতে পৌছালাম। বিকাল তিনটায় ই–মেইল খুলে দেখি মিশকাত মেইল পাঠিয়েছে। লিখেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার বন্ধুর অফিসে আমার জন্য অপেক্ষা করছে সে।

কিন্তু আমার সঙ্গে কোনোভাবেই যোগাযোগ করতে পারছে না। তাই মেইল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি যোগাযোগ করি। তার বন্ধুর অফিসে ফোন করি।

অপর প্রান্ত থেকে মিশকাত ফোন ধরেই বললো, মার্শা, কি ছ্যাকামাইসিনটাই না খাওয়ালে আমাকে।

মনে মনে বলি, ছ্যাকামাইসিন, তুমি খাওনি, খেয়েছি আমি। সুদূর নিউ জার্সি টু ওয়াশিংটন ডিসি তারপর এ কথা সে কথার পরে বলি, ঠিক আছে, হয়তো কোনোদিন কোনোখানে দেখা হবে, এখন বিদায়। কে জানতো, সেই বিদায়ই শেষ বিদায়।

তারপর কোথায় তিনি হারিয়ে গেছেন জানি না। আমার জানার আগ্রহও হয়তো অনেক শিথিল। শুধু জানার আগ্রহ একটাই, তিনি কেন মিছেমিছি এই করলেন সাক্ষাতের নামে। তার কি সত্যিই দেখা করার ইচ্ছা ছিল, নাকি দেখা করার নামে সেটা ছিল এক ধরনের প্রহসন? যদি প্রহসনই হয়ে থাকে তবে কেন সেটা করলেন আমার সঙ্গে?

কোনো সুস্থ সুন্দর মানুষের কাছ থেকে এমন আচরণ কখনো প্রত্যাশা করিনি। তারপরেও যে আচরণ পেলাম সেটা আমাকে বিব্রত করে। জানি না পরবর্তীকালে তিনি এমনভাবে হারিয়েই বা যাবেন কেন? কখনো কি তার কাছ থেকে জানতে পারবো কেন এমন লুকোচুরি খেলেছিলেন আমার সঙ্গে?

নামঠিকানা বিহীন
joejun12348@hotmail.com

আচরণ

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

কলেজ থেকে ফিরে তাশ পেটাচ্ছি। হঠাৎ চমকে উঠলাম চেনা কণ্ঠের ডাক শুনে। তাকিয়ে দেখি আমার আত্মার আত্মীয়।

বললাম, কেন ডাকিস? আমি এখন ব্যস্ত, কিন্তু মেয়েটা নাছোড়বান্দা, ডেকেই চলেছে। বিরক্ত হয়ে ছুটে গেলাম, কি হয়েছে বল।

আদেশের সুরে বললো, খেলা বন্ধ করেন।

না, এখন খেলা বন্ধ করলে তারা সন্দেহ করবে, তুই চলে যা।

খেলা শেষে বাড়িতে গিয়ে ভাত খাচ্ছি। যমের মতো সে হাজির। ভাবলাম একি! মেয়েটি এমন করে আমার পেছনে লেগেছে কেন?

কাছে এসে ধমক দিয়ে বললো, আপনি আপনার ঘরে আসবেন না?

হ্যা আসবো।

খাওয়া শেষে তার পেছনে ছুটলাম। আমার মা বাবা ভাইয়েরা সবাই তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু কেউ কিছু বললেন না। বাড়ির উঠানে এসে বললাম, তুই বাড়ির পেছন দিয়ে যা, আমি রাস্তা দিয়ে ঘুরে ওই বাড়িতে উঠবো। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে।

ইদানীং দুজনের আচার ব্যবহারে সবার সন্দেহের তালিকায় উঠে এসেছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায়নি বলে কেউ কিছু বলতে পারছে না।

বিকল্প রাস্তা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে দেখি মৌসুমী আমার ঘরের দরজার পাশে দাড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই ডাকলো ঘরে ঢোকার জন্য। কিন্তু তার মধ্যে কেমন যেন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলাম। মৌসুমীর এ বেপরোয়া আচরণ দেখে নিজের অজান্তেই মনে প্রশ্ন জাগলো, কি চায় মেয়েটি? কি তার উদ্দেশ্য? কেন এমন উন্মাদের মতো বৈরী আচরণ করছে? কেমন যেন অজানা অশনি সংকেতের আগাম আভাস পেলাম। এ জন্য মনকে সে রকম ভাবেই প্রস্তুত করলাম এবং দূর থেকেই জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ির মানুষ কই?

তার নানার বাড়ি, তার নানা আমার চাচা, দুজনেই ওই বাড়িতে থাকি। সবাই বেড়াতে গেছে, কেউ বাড়িতে নেই, মুখে বিজয়ের হাসি রেখে বললো।

বললাম, কখন গেছে?

কিছুক্ষণ আগে, এখন আসবে না। ঘরে আসুন, আপনার সঙ্গে কিছু কাজ আছে। আমি তো অবাক! এ মেয়ে বলে কি! দিন দুপুরে আহ্বান!

আমি বললাম, না, রাতে কথা হবে, এখন কেউ দুজনকে ঘরে দেখলে সব ওলট–পালট হয়ে যাবে। আমি এখন পারবো না, মাফ চাই!

আমার কথা শুনে রীতিমতো ফায়ার, ঘরে আসবেন কি না বলুন, জেদের সুরে বললো। আমি আবারো না বললাম।

আসবেন না? তাহলে দেখুন– আমার ঘরের দরজাকে লক্ষ্য করে বললো। দূর থেকেই ঘরে উকি দিয়ে দেখলাম ফাসির দড়ি টানানো – এ পর্যন্তই। কোনো কিছু বোঝার আগেই টপ করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

এদিকে ভয়ে, আসন্ন দুর্যোগের আশংকায় আমি পাগলপ্রায়। বাকরুদ্ধ হয়ে রইলাম তিন, চার সেকেন্ড। পরক্ষণেই দৌড়ে দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছি এবং বলছি, প্লিজ, আমাকে এমন বিপদে ফেলে তুই ফাসি দিস না। কান্না ও মিনতিভরা কণ্ঠে কথাগুলো বললাম।

মৌসুমী আমার কোনো কথায় কর্ণপাত করলো না। যখন বুঝলাম ডাকাডাকিতে কাজ হবে না, তখন অন্য পন্থায় ঘরে ঢোকার প্ল্যান করলাম।

এ ঘটনাগুলো খুব দ্রুত স্বপ্নের মতো ঘটে চলেছে। আমি তখন সম্পূর্ণ দিশেহারা, আমার সারা শরীর যেন ঝিম ঝিম করছে। হাত পা অবশ হয়ে আসছে। শরীর যেন নিয়ন্ত্রণহীন হতে চলছে। সব রক্ত যেন হিম হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি, কিন্তু এ মুহূর্তে নিজেকে শক্ত করতে হবে। ভেঙে পড়ার সময় এটা নয়। জানালা লাথি দিয়ে ভেঙে ঘরে ঢুকে প্রথমে দরজা খুলে দিলাম। কেউ যদি আটকানো ঘরে দুজনকে দেখে ফেলে তাহলে একদম সর্বনাশ হয়ে যাবে।

দরজা খুলে তার দিকে এগিয়ে জাপটে ধরে ফাসির দড়ি খুলে মেঝেতে নামালাম। নামানোকালে আমার কান বরাবর কষে একটি থাপ্পড় মারলো এবং বলতে লাগলো, আমি তোর কে? আমাকে তুই বাচালি কেন?

রাগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেচারি তুই তোকারি শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘর থেকে বের করে দিলাম এবং দরজায় দাড়িয়ে এক পা দিয়ে দরজা আটকে রাখলাম যেন আবার ঘরে ঢুকতে না পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুই এমন করছিস কেন? তোর কি হয়েছে?

আমি মরে গিয়ে তোকে জ্যান্ত কবর দিয়ে যাবো। তুই আমার সব কেড়ে নিয়ে শান্তি ভঙ্গ করেছিস, রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিস। আমিও তোকে অশান্তির আগুনে পোড়াবো।

কথা বলার সময় সাপের মতো ফোস ফোস করছে এবং ঘন ঘন শ্বাস টানছে। শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা, তোর একাই পৃথিবীর সব মেয়ে লাগবে? আমাকে দিয়ে তোর মন ভরে না? কোন সময় আমি তোর সাধ পূরণ করিনি?

আমি তার কথা শুনে হতভম্ব। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম এবং শান্ত সুরে বললাম, পাগলামি করিস না। এমন কাণ্ড দেখলে মানুষ কলংক দেবে।

মানুষের দোহাই দিস? আমাকে সব মানুষের সামনে মিলন খেলায় মাতিয়ে তুলবি। কর্কশ কণ্ঠে কথাগুলো এক দমে বললো।

ছি! কি বলছিস! তুই কি পাগল হয়েছিস মৌসুমী?

হ্যা, হয়েছি! তুই আমাকে পাগল বানিয়েছিস। এখন তোর ভয় করে? লজ্জা লাগে? যখন তুই রাতে সবার অগোচরে আমার সঙ্গে যৌন মিলনে মিলিত হতিস তখন তোর শরম করেনি?

তাকে যতোই শান্ত করতে চাই সে ততোই ক্ষেপে যায়। আমি যেন তার জন্মশত্রু। এমন পরিস্থিতিতে কি করবো, তাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনবো ভেবে পাচ্ছি না। কি এমন অপরাধ করেছি তার কাছে যে এমন করছে।

আকস্মিকভাবে সুর পাল্টিয়ে বললো, আপনাকে লিপি দেখা করতে বলেছে তাদের পুকুর পাড়ে। আজ সকালে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনি যাবেন না? আপনার সাবেক প্রেমিকা আপনাকে ডেকেছে।

কথাগুলো বললো একেবারে শান্ত ও স্বাভাবিক কণ্ঠে। কোনো বিদ্রূপ কিংবা খামখেয়ালিপনা ছিল না তার বলার ভঙ্গিতে। যতোটুকু না কষ্ট পেয়েছি তার আজকের কর্মকাণ্ডে, এর চেয়েও বেশি হতবাক হয়েছি মেয়েটির হঠাৎ পরিবর্তন দেখে। এতোক্ষণে তার অস্বাভাবিক আচরণের কারণ ধরতে পেরেছি। তার এ পাগলামির দুটি কারণ ছিল – অবিশ্বাস আর সন্দেহ।

বললাম, লিপি আমার পুরনো প্রেমিকা ছিল সেটা তো নিজেও জানিস এবং এ–ও জানিস, এখন তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে কেন মিছামিছি এমন নেতিবাচক আচরণ করলি? এদিকে বাড়ির সবাই চলে আসছে। বাড়ির লোক আসতে দেখে তাকে বললাম, মৌসুমী, আজ বুঝি সবই গেল। তোর নানি, মামি চলে আসছে, আমি যাই।

মৌসুমী আমাকে বাধা দিয়ে বললো, যাবেন না, বসুন। এখন চলে গেলে তারা কিছু মনে করতে পারে।

আদৌ পেরেছি কি সবাইকে ফাকি দিতে? সবার সন্দেহের ঊর্ধে থাকতে? না, পারিনি।

মৌসুমীর এ বেপরোয়া আচরণের শাস্তিস্বরূপ বিদায় নিতে হলো ওই বাড়ি থেকে এবং চিরতরে ভেঙে গেল তিল তিল করে গড়ে ওঠা দুজনের গভীর সম্পর্ক। হয়ে গেলাম একেবারে একা। নিঃস্ব। পরিণত হলাম ব্যর্থ এক প্রেমিকে।

দীর্ঘ দুটি বছর কারো ছায়া কেউ মাড়াইনি। কি যে দুর্বিষহ ছিল সে দিনগুলো। আজো ভাবতে আমার গা শিউরে ওঠে।

পরে শুনলাম, তাকে নাকি তার মা–বাবা এবং নানি কসম দিয়েছিল আমার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার জন্য।

আজো আমি মৌসুমীকে ভুলতে পারিনি, ভুলিনি দুজনের প্রসন্ন প্রহরের স্মৃতিগুলোও। ভুলতে পারবো কি না তাও জানি না।

আমার মনে একটাই প্রশ্ন, এখনো যাতনা দিচ্ছে, কি এমন দোষ ছিল আমার?

কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা থেকে

ভারসাম্য

মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন

প্রিয়তমা, এখন তোমাকে একটা কথা বলবো। সেটা হচ্ছে ভালোবাসা।

ভালোবাসা : যার কোনো দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা নেই, শুধু গভীরতা আছে এবং যে গভীরতা কোনো ইকোসাউন্ডার দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। অনুভব করা যায় মাত্র তাকে ভালোবাসা বলে। তবে এমএস হোসেন নামে এক বিএন বিজ্ঞানী ভালোবাসা নির্ণয়ের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন সেটার নাম দিয়েছেন লাভোমিটার।

মহান সৃষ্টিকর্তা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি বস্তুকে সুষমভাবে বণ্টন করেছেন। তাই পৃথিবী বহুকাল থেকে সুন্দরভাবে চলছে। কোথাও বিশৃঙ্খলা নেই। যদি এ বণ্টন সুষমভাবে না হতো তাহলে পৃথিবী এতোদিন টিকে থাকতো না। তেমনি প্রতিটি মানুষের অন্তরে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভালোবাসা থাকে। আর এ ভালোবাসাকে পৃথিবীর মতো সুষমভাবে বণ্টন করতে হবে। তাহলে ভালোবাসা আজীবন টিকে থাকবে। এটা যদি সুষমভাবে বণ্টন করা না হয় তাহলে জীবনে কখনো শান্তি আসবে না। একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। সুতরাং আমি তোমাকে ১০০ ভাগ ভালোবাসি অথবা এ জীবন শুধু তোমার জন্য– এমন

কথা বলে প্রতারণা করা ঠিক নয়। তাই আমার অন্তরের ভালোবাসাকে নিম্নরূপে প্রকাশ করেছি। মনে করি মোট ভালোবাসার পরিমাণ ১০০।

১। মা বাবা	২৫%	৫। প্রকৃতি	৯%
২। প্রিয়তমা	২২%	৬। অন্যান্য আত্মীয়	৮%
৩। দেশ/পেশা	১৬%	৭। নিজ গ্রাম	৪%
৪। ভাইবোন	১৫%	৮। দোদুল্যমান	১%

আর হ্যা, শতকরা ১ ভাগ দোদুল্যমান অবস্থায় রাখা হয়েছে যেটা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে কখন কার সঙ্গে যোগ হবে বলা মুশকিল। এটা শুধু ভালোবাসার ভারসাম্য রাখার কাজে ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে সবকিছুতে ফু-র ব্যবস্থা আছে। তাই আমি প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে কমপক্ষে ৫৮ মিনিট তোমার কথা ভাবি। তবে ৬৩ মিনিটের বেশি ভাবি না। কারণ অতিরিক্ত কিছু ভালো নয়। যেমন, পরিমিত চুন পানে স্বাদ বাড়ায়। পক্ষান্তরে বেশি চুন জিভ পোড়ায়।

বাংলাদেশ নেভি থেকে

স্পর্শের বাইরে

ভালোবাসা অত্যন্ত পবিত্র। আমাদের জীবনে আমরা তা প্রমাণ করেছি। আজ ভালোবাসা দিবস তাই তুলে ধরছি। পঞ্চাশ দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের গোড়ার দিকে আমি ছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের ছাত্র। থাকতাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। সে সময় আমাদের ক্লাস হতো তদানীন্তন কলাভবনে। বর্তমানে ঢাকা মেডিকাল কলেজের দক্ষিণাংশে। ইউনিভার্সিটির সামনের রাস্তায় ছিল বড় সবুজ শাখা বিস্তৃত বৃক্ষরাজি এবং উন্মুক্ত সবুজ খেলার মাঠ যা এখন স্টেডিয়ামে রূপান্তরিত।

আমার মনের মানুষটি তখন পড়তো টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজে। থাকতো কলেজ হস্টেলে। কিন্তু আমাদের মন দেয়া-নেয়ার ধরন ছিল এখনকার সময় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজকাল ধানমন্ডি লেকের পাড় দিয়ে গেলে দেখা যায় প্রেমিক-প্রেমিকা মুখোমুখি বসে এমনকি কখনো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে প্রেম নিবেদন করছে। অথচ আমাদের ভালোবাসার আঙ্গিক ছিল এসব থেকে আলাদা। এমনকি *আমি তোমাকে ভালোবাসি* এরূপ বাক্যও কখনো উচ্চারণ করিনি। যদিও আমরা পরস্পর চিঠি লেখালেখি করতাম। তবুও তাতে কোনো ভাবাবেগ ছিল না। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসলেও ভালোবাসার কথা না বলাই রয়ে গেছে। অনেকটা লজ্জায় বা সংকোচে আমাদের ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু মনে দুজনের ভালোবাসাই ছিল গভীর আন্তরিক এবং সম্পূর্ণ নিখাদ।

আমাদের ভালোবাসার সীমারেখা কখনো শালীনতার অলিখিত প্রাচীর ডিঙিয়ে যায়নি। আমাদের পত্রে আমরা পরস্পরের মঙ্গল ও লেখাপড়ার উন্নতি কামনা করেছি। অথচ জানতাম যে, আমরা একে অপরকে ভালোবাসি। আমাদের মধ্যে অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ ঘটেছে। কখনো একে অপরের শরীর স্পর্শ করিনি। একবার বৃষ্টি পড়ছে তখন সময় তাকে ছাতা দিয়ে এগিয়ে দিয়েছি। বেশ মনে পড়ে। তবু সে ছিল আমার স্পর্শের বাইরে। অনেকের কাছেই বিশেষ করে আজকের প্রজন্মের কাছে তা অনেকটা অবিশ্বাস্যই মনে হবে। কিন্তু আমরা দুজনই জানি, এ কথা ধ্রুব সত্য।

লেখাপড়া শেষ করে চাকরিতে যোগদানের দুই বছর পর আমাদের প্রণয় পরিণয়ে রূপান্তরিত হয়। সে সময় সেও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে।

আমরা এখন স্বামী-স্ত্রী এবং আমাদের বৈবাহিক জীবনের ৪১ বছর পূর্ণ হয়েছে গত ২৮ মার্চ। আমাদের দুটি সন্তান। দাম্পত্য জীবনে আমরা সুখী। অনেক দম্পতি থেকে ভিন্ন। আমাদের নেই কোনো ভুল বোঝাবুঝি। আমরা একজন অন্যজনকে ছাড়া ভাবতে পারি না।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

স্বামী

কাকলী

ভালোবাসা দিবসে নিজের মানুষটিকে নিয়ে কতো অভিজ্ঞতার কথাই না মনে পড়ছে। দীর্ঘ পাচ বছর সম্পর্কের পর বিয়ে হয় আমার। আমি খুব সুখী। আমার স্বামী অত্যন্ত সহজ–সরল। তার সারল্য আমাকে মাঝে মধ্যে খুব কষ্টও দেয়। যাক, যে অভিজ্ঞতার জন্য লেখা।

বিয়ের পর থেকেই আমার একার সংসার। সে ছোট সরকারি চাকরিজীবী। প্রতিটি ঈদের শপিংয়ে ওই আমাকে নিয়ে যায়। ইচ্ছা মতো নিজের পছন্দের জিনিস কেনার প্রায় শেষ প্রান্তে যখন ওর মৃদুভাবে *থামো* শব্দটি শুনতাম তখন মুখটা কালো করে বাসায় ফিরে আসতাম। আগেই বলেছি, আমার একার সংসার। আমার একটি মাত্র সন্তান। বিয়ের পর তাই ঈদের কেনাকাটা সব সময় আমার একার স্বাচ্ছন্দেই করতাম এবং তা যথেষ্টই।

আজ থেকে প্রায় তিন চার বছর আগে এক ঈদে ভাবলাম আমার বোনের সঙ্গে এবার ঈদ শপিংয়ে যাবো। তাহলে নির্দ্বিধায় সব কিছু কিনতে পারবো। তাকে বললাম, সম্মতিও পেলাম।

জানতে চাইলো কতো হলে চলবে।

কি ভেবে পাচশ টাকা চাইলাম। এখানে বলে রাখি নিজ হাতে টাকা খরচ করে কেনাকাটা এর আগে করিনি। যখন যা প্রয়োজন হতো সেই নিয়ে আসতো। অথবা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতো। তাছাড়া বিয়ের আগে আব্বা আর বোনদের পছন্দেই কেনাকাটা হতো। তাই খরচ সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না। সুতরাং পাচশ টাকা আমার কাছে অনেক কিছু মনে হতো।

মার্কেটে গেলাম। কিছু একটা কেনার পরই আমার টাকা শেষ। লজ্জায় বোনকেও কিছু বলতে পারছি না। ফিরে এসে স্বামীকেও কিছু বলছি না। কিন্তু আমার যে কোনো কেনাকাটাই হলো না! আমার একটা মানিক যার জন্য জামা কিনি হাজার টাকা দিয়ে, অথচ কিছুই কিনতে পারিনি। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলাম। অনেক ভেবেচিন্তে তাকে বললাম, আমার টাকা লাগবে।

সে অবলীলায় অনেকগুলো টাকা বের করে দিল। সে হয়তো বুঝতে পেরেছিল আমার বোকামির কথা।

পরে যখন তার কাছে সব খুলে বললাম, সে খুব হাসলো আর আমার ভালোবাসায় মনটা ভরে গেল।

আজ নিজ হাতে অনেক খরচ করি। অনেক সময় আয় থেকে বেশি ব্যয় করে ফেলি। আমার বিত্তবৈভব নেই, তারপরও আমি সুখী। মাঝে মধ্যে ভাবি, যেখানে আমাদের দেশের মেয়েরা স্বামীর কাছে অবহেলিত, সেই দেশে বাস করে আমি কতই না সুখী। সে সুখের মাঝে রয়েছে আন্তরিকতা, রয়েছে ভালোবাসা।

আজ *ভালোবাসা* দিবসে আমার ভালোবাসা রইলো তার ওপর যে আমাকে দিয়েছে অর্থনৈতিক মর্যাদা, করেছে সুখী, আর মূল্যায়ন করেছে আমার প্রতিটি চাওয়াকে। এই দিনে সমবেদনা রইলো ওই সব নারীর প্রতি যারা *স্বামী* নামের মানুষটির কাছে সব সময় অনাদর আর অবহেলায় নিষ্পেষিত হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

ACE ট্যাবলেট

রুয়েল

পাগলীর (ছদ্মনাম) সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন যেন নাটকীয়ভাবে হয়ে যায়। সময়টা ২০০৪ সাল যখন আমরা অনার্সে ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরু করি। পছন্দমতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারায় মন খারাপ থাকতো।

নিজেকে সব সময় গুটিয়ে রাখতাম। তখন দেখতাম অগোচরে কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে। ব্যাপারটা কেমন যেন ভালো লাগতো। ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। পাগলীকে আমার কথাগুলো বলার জন্য সুযোগ খুজতে লাগলাম। সম্ভবত ঈদের কয়েকদিন আগে আমাদের ক্লাস টিউটরিয়াল ছিল তাই পরীক্ষার আগে ক্লাসে পড়ছিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম সে এসে মাথা নিচু করে বসে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

বললো, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছে। আমাকে অনুরোধ করলো এক গ্লাস পানি এনে দিতে।

সম্ভবত এটাই ছিল আমাদের প্রথম কথা।

এনে দিলাম। এরপর বললাম, ওষুধ খাবে কি না।

সে হ্যা না কিছুই বললো না।

নিচে নেমে দোকান থেকে একটা ইউঋ ট্যাবলেট এনে খেয়ে নিতে বললাম। তারপর গেলাম পরীক্ষার হলে।

পরীক্ষা শেষে এসে দেখি সে নেই। প্রচণ্ড রাগ হলো। পরদিন সে আগেই কলেজে এলো এবং আমাকে না বলে চলে যাওয়ার জন্য বার বার সরি বলতে লাগলো। এরপর কি আর রাগ করে থাকা যায়? তাকে সব সময় আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আগ্রহী মনে হতো। আমরা একে অপরকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানলাম। এরপর কেন যেন মনে হতো তাকে ছাড়া আমার চলবে না। সবকিছুই তাকে ছাড়া অর্থহীন মনে হতো। কিছুদিন পর ঈদের জন্য কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধের দিনগুলোতে কিছুই ভালো লাগতো না। প্রচণ্ড একটা মানসিক কষ্ট আমাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করতে লাগলো।

বন্ধের পর ২৯ জানুয়ারিতে আমাদের আবার দেখা হলো স্যারের বাসায়। স্যারের বাসার ছাদে বুকের মৃদু কাপুনি, দুই হাটুর কাপুনি নিয়ে তাকে সাহস করে বললাম, অ টব ধভ ফমশণ. আমি তোমাকে ভালোবাসি।

সে শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, থাকবে তো?

সেই থেকে আমরা একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছি আমি তাকে ছাড়া এবং সে আমাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। আমরা স্বপ্ন দেখি, স্বপ্নে হারিয়ে যাই। স্বপ্ন দেখি আগামী সুন্দর দিনের। আমরা অধীর অপেক্ষায় আছি ২৯ জানুয়ারিতে আমাদের ভালোবাসা বার্ষিকীর জন্য।

ধন্যবাদ ইউঋ ট্যাবলেট।

বরিশাল থেকে

চিঠি

লিন্টু

প্রিয়তমা

আরো একটি ভ্যালেনটাইনস ডে দোরগোড়ায়। মনে পড়ে, প্রতিবছর ভ্যালেনটাইনস ডে-তে তোমার জন্য অবশ্যই একটা লাল গোলাপ নিয়ে যেতাম। তুমি মিষ্টি হেসে গ্রহণ করতে। আজ তা কেবলই স্মৃতি। আচ্ছা, তুমি সব সময় আমাকে ভুল বোঝ কেন? তুমিতো ভালো করেই জানো আমি একটু নার্ভাস প্রকৃতির। তোমার সামনে গেলেই আমার সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। যা বোঝাতে চাই বোঝাতে পারি না। দশ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছি তোমাকে বোঝাতে। কিন্তু কোনোটাই পারিনি। তুমি চারপাশে তোমার রহস্যের জাল বিছিয়ে রাখতে পছন্দ করো। সে জালে আটকা পড়ে বাইলা মাছের মতো আমার অবস্থা ছিন্নভিন্ন।

আমার বিশ্বাস আমি তোমাকে একদিন বোঝাতে পারবোই আমি তোমাকে কতো ভালোবাসি। তুমি প্রতিনিয়ত আমার সঙ্গে হাজারটা মিথ্যা বলে গেছো। তবুও তোমার প্রতিটি কথা আমি অন্ধের মতো

বিশ্বাস করেছি। জানি আমাকে পছন্দ করার মতো কোনো কারণই নেই। আমি হিরো টাইপের কেউ নই। একটা ভালো শার্ট–প্যান্টের ভেতর গুজে একজোড়া জুতা পরে দামি গিফট নিয়ে তোমার সামনে দাড়ানোর সামর্থ আমার ছিল না। অর্থবিত্তের দিক থেকে তোমার তুলনায় আমি কিছুই না। ধুলোবালির মতো। তোমাকে প্রচণ্ড ভালো লাগলেও কখনো সাহস করে বলতে পারিনি। ভয় হতো কি না আমও যায় ছালাও যায়। আমি আগাগোড়াই মধ্যবিত্ত। তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাটা ছিল অতিমাত্রায় বিলাসিতা। তবুও অনেক বড় স্বপ্ন দেখতাম। মনে হতো তোমার অনুপ্রেরণা। কয়েক বছর পর রীতাআপা ও রুমাআপার ধাক্কাধাক্কিতে ভালোবাসার কথা জানালাম। তুমি হেসে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু আমি আশা ছাড়িনি। তোমায় নিয়ে রঙিন স্বপ্ন দেখলাম না। সকাল সন্ধ্যায় পূজা করতে লাগলাম তোমার।

অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য ২০০১–এ এলাম মিডলইস্টে। চিঠি লিখলে তুমি উত্তর দিতে খুব সুন্দর করে। খুব আশা জাগতো মনে। কি আশ্চর্য মেয়ে তুমি! চমৎকার, সব কুল রক্ষা করে চলতে। আমি ডুবে গেলাম চিরতরে। আমার দুর্ভাগ্য, প্রবাসে এসে সোনার হরিণ ধরা হলো না। দুবছর পর দেশে এলাম। আমার ছোট জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময় ছিল সেটা। হাতে একটা ফুটা পয়সাও ছিল না। কিন্তু তোমাকে কতোভাবে সাজাতে ইচ্ছা হতো। কতো কিছু গিফট করতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু তোমার জন্য কিছুই নিয়ে আসতে পারিনি। তাছাড়া ছিল পারিবারিক চাপ। একদিকে তুমি অন্যদিকে পরিবার। আমি পারিনি কাউকে খুশি করতে।

তুমি Polo খেতে খুব পছন্দ করতে। দোকানের সামনে গেলেই ইচ্ছে হতো পুরো এক কার্টন কিনে নিই তোমার জন্য। সেটা ছিল আকাশ–কুসুম কল্পনা। কারণ আমি প্রতিদিন ভাইয়ার কাছ থেকে পাচ দশ টাকা হাত খরচ পেতাম। গোল্ডলিফ ছেড়ে নেভিতে নেমে যেতে হলো, তাও তিন–চারটা। রিকশার বদলে মুরাদপুর বা অক্সিজেন যেতাম টেম্পোতে বা শহর এলাকার বাসে চড়ে। দুই চার টাকা করে জমাতাম প্রতিদিন। এভাবে বিশ ত্রিশ টাকা হলে তোমার সঙ্গে দেখা করার উদ্যোগ নিতাম। দশ টাকায় একটা Polo আর দরদাম করে তিন টাকায় একটা গোলাপ নিয়ে সাত নাম্বার বাসে ঝুলতাম। তুমি মাঝে মাঝে অভিমানের সুরে বলতে, Polo একটা কেন, দুটো আনলাম না কেন। তখন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতাম। কিন্তু কখনোই তোমাকে বলতে পারিনি উপার্জনহীন আমি কিভাবে একটা Polo কিনতাম। দুটো কিনতে গেলে যে আমাকে হালিশহর থেকে মুরাদপুর পর্যন্ত হেটে যেতে হবে।

বাসে যেতে সারাটা পথ বুক ফেটে কান্না আসতো। সব সময় তোমাকে দেখার জন্য মনটা আনচান করতো। একদিন জানতে পারলাম তোমার নতুন প্রেমিকের কথা। তুমিই জানালে তোমাকে মোবাইলসহ দামি গিফট দিচ্ছে। বুঝলাম তুমি ধীরে ধীরে তার দিকে ঝুকে পড়েছ। নিজের অক্ষমতায় নিজের ওপর রাগ হলো খুব। তোমাকে ভুলে যেতে চাইলাম। কতো চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।

রেললাইনের মতো সমান্তরালভাবে চলতে লাগলাম আমরা। খুব কাছেও না, খুব দূরেও না। অনেক চেষ্টার পর আবারও প্রবাসে এলাম। সংগ্রাম করছি প্রতিনিয়ত। স্বপ্ন দেখি একদিন অনেক টাকা হবে। তোমাকে দামি গিফট দেবো। দামি মোবাইল, হীরের গহনা, রিকশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়াবো। আমৃত্যু এ স্বপ্ন দেখতেই থাকবো।

প্লিজ আমাকে কখনো ভুল বুঝো না। আমি খুব সাধারণ টাইপের মানুষ। কখনো তোমার ক্ষতির কল্পনাও করিনি। প্রেমিকাকে জোর করে তুলে নেয়া বা এসিড নিক্ষেপ করা কোনোটাই আমাকে দিয়ে হবে না। বড়জোর দুঢোক বাংলা গলায় ঢেলে ঝিম মেরে পড়ে থাকবো। ব্যস এটুকুই। আজ ছয় মাস ধরে তোমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। তোমরা বাসা বদল করেছো, তোমার মোবাইলের সিমও। প্লিজ অন্তত একটা মেসেজ দিও। পারলে একটা চিঠি। আমি বদলাইনি, বদলায়নি আমার ঠিকানাও।

সাফাত, কুয়েত থেকে

বনি

সল্লিল

এক বছর হলো স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় এসেছি। ব্যস্ততম এ দেশে এসে শত ব্যস্ততার মধ্যে কখনো মন হারিয়ে যায় আমার প্রিয় সুদূর বাংলাদেশে যেখানে রয়েছে প্রিয় মানুষেরা, বিশেষ করে আমার জীবনের সেই একজন যাকে নিয়ে এ লেখা।

তখন আমার পায়ের নিচে যে মাটি ছিল সেটা মাটি নয় যেন থকথকে কাদা যে কাদায় স্থির দাড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। সময়ের পরিক্রমায় সে থকথকে কাদা পরিণত হয়েছে শক্ত পাথুরে মাটিতে। এখন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারি বলেই স্বপ্ন দেখার সাহস পাই।

প্রেম বা ভালোবাসা শব্দটি কয়েকটি অক্ষর নিয়ে গঠিত একটি শব্দ যা প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই আসে। মনে করা হয় অদৃশ্য প্রেমের দেবতা কিউপিডের ছুড়ে দেয়া তীর মানব–মানবীর হৃদয়ে বিদ্ধ হলে হৃদয় তখন কথা বলা শুরু করে অর্থাৎ হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত হয়।

আসলেই কি কিউপিডের ছুড়ে দেয়া তীর, নাকি শরীরবৃত্তীয় কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া–বিক্রিয়ার কারণে প্রেম ভালোবাসার উৎপত্তি হয়? জানি না কবে বা কখন কিউপিড আমাকে উদ্দেশ্য করে তীর ছুড়েছিল। হয়তো যেদিন থেকে বনিকে দেখলাম, মনে হয় তখনই বা তার আগে কোনো এক সময় তীরটি ছুড়েছিল। বনিকে না দেখেই তার প্রেমে পড়ে যাই। অনেকটা কিশোর কুমারের সেই গানের মতো–

তারে আমি চোখে দেখিনি
তার অনেক গল্প শুনেছি
গল্প শুনে তারে আমি
অল্প অল্প ভালোবেসেছি।

সময়টা ছিল ২০০৩ সালের মার্চ মাস। বনির তখন এসএসসি পরীক্ষা চলছিল। একদিন তাকে ফোন করলাম। সে আমাকে চিনতে পারেনি আর আমিও নিজের পরিচয় গোপন রেখেছিলাম। এভাবেই নিজের পরিচয় গোপন রেখে তার খোজখবর নিতাম। পরবর্তী সময়ে প্রায়ই আমাদের ফোনে কথা হতে থাকে। কিন্তু আমরা পরস্পর মুখোমুখি হইনি।

আমার গ্রামের বাড়ি এবং তার বাড়ি পাশাপাশি। দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্কও বেশ ভালো। ছুটিতে যখন বাড়িতে যেতাম, অন্যদের সঙ্গে কথা হলেও নিজস্ব লাজুকতা থেকে বনির সঙ্গে কোনো কথা বলা হতো না। কিছুদিন পর সাহস করে বনিকে ফোনে দীর্ঘ দিনের জমে থাকা অব্যক্ত কথাগুলো বললাম এবং তাকে অনুরোধ করলাম চিন্তা ভাবনা করে উত্তর দিতে। ততোদিনে বনি এবং তার বোন বীথির সঙ্গে আমার একটা চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

এক মাস পর যখন উত্তর শুনতে চাই, সে শুধু বলেছিল, না।

এখন বুঝতে পারি তার এই না ছিল মুখের কথা, মনের কথা নয়। তার মুখে না শুনে ভীষণ কষ্ট পাই। কিন্তু হাল না ছেড়ে নিজের কক্ষপথে থাকি।

বীথি ছিল বনির কাজিন এবং আমার একজন ভালো বন্ধু, সে আমার মন খারাপ দেখে প্রায়ই ভর্ৎসনা করতো। কারণ প্রেম ভালোবাসার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এক মাস সময় খুবই অল্প। বীথি আমাকে সব সময়ই বলতো, ভালোবাসা এমন একটা জিনিস যা অর্জন করে নিতে হয়। অর্জিত ভালোবাসার দাম অনেক বেশি। পরবর্তী এক বছর বনিকে বোঝাতে চেয়েছি আমার ভালোবাসার গভীরতা।

হঠাৎ আমেরিকায় আসার ভিসা পাই। আমেরিকায় আসার কয়েক দিন আগে বনি ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমার সঙ্গে ছিল চার বন্ধু। প্রথম কয়েক দিন হাসি–কান্নায় কেটে যায়।

সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও আমার মনে একটা কথাই বার বার ঘুরপাক খাচ্ছিল, তা হলো, আমি কি হেরে গেলাম? খুব জানতে ইচ্ছা করতো এতোদিনে তার মনে আমার জন্য কোনো ভালোবাসার জন্ম

হয়েছে কি না? আবার কিছুটা অভিমানও হলো। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম এ ব্যাপারে কোনো কিছুই বনিকে জিজ্ঞাসা করবো না। বরং স্বাভাবিকভাবে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসবো।

ঢাকায় আসার আগের দিন রাতে বীথির বাড়িতে সবাই বসি আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে। বন্ধুরা আমাকে বিচারালয়ে আসামির কাঠগড়ায় দাড় করায়। তাদের প্রধান বিষয় ছিল, আমি আমেরিকায় যাচ্ছি, এ অবস্থায় বনির ব্যাপারে কি করবো? আমি কি বলবো অপেক্ষা করতে, নাকি গত এক বছর ধরে যা হয়েছে তা ভুলে গিয়ে এখানেই থেমে যাবো?

বিচারকের সামনে আসামি যেমন করে কথা বলতে পারে না তেমনি আমিও তাদের জবাবে কিছু বলতে পারিনি। আসলে সে মুহূর্তে আমার কিছুই বলার ছিল না। কারণ তখন পর্যন্ত নিশ্চিত ছিলাম না বনি আমাকে ভালোবাসে কি না? তাই শুধু নির্বাক শ্রোতার মতো শুনে গিয়েছিলাম আর চোখ বেয়ে নেমেছিল অশ্রুধারা। এভাবে থমথমে অবস্থার মধ্য দিয়ে দুই তিন ঘণ্টা পর সবাই চলে আসি আমাদের বাড়িতে আমার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নকে অনিশ্চয়তার ওপর ছেড়ে দিয়ে।

পরদিন সকাল আটটায় বীথি বলেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। সেই উদ্দেশে তাদের বাড়ি যাই।

তখন বীথি আমাকে বলে, গত রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা সে বনিকে সম্পূর্ণ খুলে বলেছে এবং এটা শুনে বনি ভোর থেকেই খুব কান্নাকাটি করছে। আসলে বনি ছিল চাপা স্বভাবের তাই আমরা কেউ-ই তাকে বুঝতে পারিনি।

একাকী বনির সঙ্গে দেখা করতে যাই আর পথ থেকে কুড়িয়ে নিই তার ছিড়ে ফেলে দেয়া গোলাপ কলি ও পাপড়িগুলো। বিদায়বেলা খোলা আকাশের নিচে আমি ও বনি মুখোমুখি দুজন। দুজনেই নির্বাক, কিছু বলতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু কথাগুলো গলার কাছে এসে আটকে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছে এই বুঝি বুকের ভেতর জমে থাকা কথাগুলো কান্না হয়ে বেরিয়ে আসবে। অবশেষে তা-ই হলো, নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। দুজনের চোখ বেয়ে নেমে এসেছিল অশ্রুধারা যাতে ভেসে গিয়েছিল সব পুরনো ব্যথার কথা আর বনি প্রকাশ করলো তার ভালোবাসা এবং নিশ্চিত হলাম আমি জয়ী। অনেকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *হৈমন্তী* গল্পের অপুর মতো *আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম*।

বাস ছাড়ার সময় হয়ে যায় তাই দেরি না করে তাদের বাড়ি থেকে আসি আর সঙ্গে নিয়ে আসি তার ছিড়ে ফেলা গোলাপ পাপড়িগুলো যা এখনো সযত্নে রেখে দিয়েছি এবং থাকবেও চিরকাল। যদিও শুকিয়ে গেছে পাপড়িগুলো কিন্তু আমার হৃদয়ে বনি ছিল, আছে এবং থাকবে সতেজ হয়ে, সে কখনো বার্ধক্যে উপনীত হবে না।

এখন বনির চোখ দিয়ে দেখি জীবনের সব স্বপ্ন, সুখ-দুঃখ কিংবা আনন্দ-বেদনার ছবি। তার কথা ভেবে কোনো বরফ ঢাকা সকাল ভীষণ সুন্দর হয়ে ওঠে। তখন তাকে আমার ভালোবাসার বার্তা পাঠাই।

বনি তুমি কি জানো, আটলান্টিকের এপার থেকে প্রতি মুহূর্তে তোমাকে অনুভব করি? এবং প্রতিটি মুহূর্তে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে ভালোবাসি, ভালোবাসি এবং শুধুই ভালোবাসি।

নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা থেকে

মা

মামুন

একটি মাত্র অক্ষর আর একটি ছোট্ট ধ্বনি মা। পৃথিবীতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ উপহার। এই শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বা মনে পড়তেই পরম শান্তিতে মন ভরে যায়। মায়ের স্নেহের পরশে নিমিষেই দূর হয়ে যায় সকল ব্যথা, বেদনা, দুঃখ আর কষ্ট। মা শব্দটির সঙ্গে তুলনা করার মতো কোনো শব্দ তৈরি হয়নি, হবেও না কোনোদিন। মার তুলনা মা নিজেই। তিনি শুধু একজন আদর্শ মা নন আদর্শ গৃহিণীও। ২৩ মার্চ আল্লাহ তাকে মাতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছেন। এ দিনটিই হয়তো মায়ের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন। আমাকে

দিয়েই মায়ের প্রথম মা ডাক শোনা। আমাকে নিয়ে সব কিছুতেই তার চেষ্টার ত্রুটি দেখিনি। দেননি কখনো অভাব অনুভব করতে। আমি সব সময় চেষ্টা করি আমার মাকে অনুসরণ করতে। আমাকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। হয়তো আমি পারবো তার অব্যক্ত আশাগুলো পূরণ করতে।

দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে অনেক কষ্টে আমাকে এই পৃথিবীর সুন্দর আলো দেখালেন। এই দরদি মা আমাকে বড় করতে অনেক কষ্টের শিকার হয়েছেন আর সেই কষ্টকে একমাত্র আমার জন্যই মেনে নিয়েছেন। নিজের সুখ শান্তির কথা একবারও চিন্তা করেন না। সারাক্ষণ শুধু আমাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। ভাবেন কিসে আমাদের কল্যাণ হবে। সামান্য কষ্টও যেন না পাই এটাই তার সারাক্ষণের চিন্তা।

বাবা ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। মায়ের একান্ত চেষ্টায়ই পড়তে শিখেছি। বাবা শুধু অর্থের জোগান দিয়েছেন। মার কাছ থেকেই প্রথম শিখেছি প্রিয় মাতৃভাষা। তিনি সন্ধ্যা বেলায় বিছানায় শুইয়ে মুখে মুখে ছড়া ও কবিতা শিখিয়েছেন। একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজ, পেন্সিল দিয়ে মা লেখা শেখানোর জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। আমি নানা রকম দাগ কেটে লেখার অভ্যাস করতাম। এভাবে মা-ই আমাকে লেখাপড়ার অভ্যাস গড়িয়েছেন। মাঝে মাঝে স্কুল আর প্রাইভেট শিক্ষককে ফাকি দেয়ার অভ্যাসও ছিল। স্কুল ফাকি দিলে মা খুব রাগ করতেন। পরদিন মা নিজেই নিয়ে যেতেন স্কুলে অথবা প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে। যতোদিন স্কুলে পড়েছি ততোদিন মা-ই ছিলেন নির্ভরযোগ্য বন্ধু। মায়ের চেষ্টায় আমি এখন এমকম অধ্যয়নরত।

মা আমাকে কখনো ভুল বোঝেন না। কোনো বন্ধুকে কোনো কথা না বলতে পারলেও আমার মাকে আমি সব কিছু বলি নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে। মা আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু।

মা-র পারিবারিক ব্যবস্থাপনা আমাকে মুগ্ধ করে। তার পারিবারিক বাজেটের শতকরা ষাট ভাগ ব্যয় করেন আমাদের শিক্ষা খাতে। তিনি সারা দিন ব্যস্ত থাকেন আমাদের নিয়ে। তিনি আমাদের ভালোবাসেন জীবনের চেয়েও বেশি। শত কষ্টের মাঝেও তিনি থাকেন হাসি-খুশি। মা খুব পান খান। সেই মুখখানা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। মাকে নিষেধ করি পান খাওয়ার জন্য। তখন তিনি হাসেন আর মায়ের অনুপস্থিতিতে সেই হাসি ফুটে ওঠে আমার অন্তরে। মাতৃস্নেহের তুলনা নেই।

চান্দিনা রোড, দেবিদ্বার, কুমিল্লা থেকে

একই বৃন্তে

মাহবুবুর রহমান

বিকেল পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। সন্ধ্যায় ভাবী হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল সে আমাদের সঙ্গে লাকসাম ফিরছে না। মেজাজটা ভীষণ বিগড়ে গেল। লাকসাম ফেরার কথা তিনজনের। আমি, আতিক এবং ভাবী। অনেক পথ জার্নি, তাই একটু আরাম করে যাবো এই ভেবে টিকেট করলাম চারটা। এখন দুটো টিকেট অকেজো হয়ে গেল। টিকেট কাউন্টারের সামনে দুই মিনিট দাড়ালে টিকেট দুটো বিক্রি করা কোনো ব্যাপারই নয়। এটা যখন মনে হলো, তখনই একটু হাফ ছেড়ে বাচলাম। কাউন্টারের সামনে দাড়িয়ে টিকেট বিক্রি করাটা খুব একটা শোভনীয় নয়। লোকে ব্ল্যাকার মনে করবে ভেবে মনটা একটু খারাপ।

রাত এগারোটা বিশ মিনিটে ট্রেন ছাড়ার সময়। তাই রাত দশটা ত্রিশ মিনিটেই আমি ও আতিক ঘর থেকে বের হলাম। বাসা থেকে স্টেশন পৌছতে ত্রিশ মিনিটের বেশি সময় লাগলো না। টিকেট বিক্রি করবো কি না এ নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাজ করছিল। এক সময় আতিককে বলেই ফেললাম, টিকেট বিক্রি করবো না।

কিন্তু আতিক কোনোভাবেই রাজি হলো না টিকেট দুটো রেখে দিতে। সে বললো, দেখ দুটো টিকেটের দাম প্রায় তিনশ টাকা। দশ বিশ টাকা হলে কথা ছিল।

আমি কথা বলার সুযোগ পেলাম না, এর আগেই সে দৌড়ে গেল কাউন্টারের সামনে। ধীরে ধীরে কাউন্টারে এসে আতিকের কাছ থেকে একটু আড়াল হয়ে দাড়ালাম। কাউন্টারের সামনে ভদ্র পোশাকধারী এক ব্যক্তিকে চেচামেচি করতে দেখে আতিক লোকটির কাছে গিয়ে বললো, কি হয়েছে? কোনো সমস্যা?
লোকটি চেচাতে চেচাতে বললো, দেখেন না ভাই, শালারা টিকেট দিচ্ছে কিন্তু সিট দিচ্ছে না। সব স্ট্যান্ডিং। এখন যদি বিশটা টাকা হাতে ধরিয়ে দিই তখন দেখবেন ঠিকই শ শ সিট আমদানি হবে।
লোকটার ভীষণ চেচামেচি দেখে আমিও কাছে গেলাম।
আতিক বললো, যদি কিছু মনে না করেন, আমার কাছে দুটো অতিরিক্ত টিকেট আছে, আপনি চাইলে টাকা দিয়ে নিতে পারেন।
লোকটি তৃপ্তির হাসি হাসলো।
আতিক দুটো টিকেটই তাকে দিল। তিনি টিকেট দুটো হাতে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কি যেন দেখতে লাগলেন।
আতিক টাকা চাইতেই তিনি এমন একটা ভাব করলেন যেন এতোক্ষণ স্বপ্ন জগতে ছিলেন। তারপর পকেট থেকে দুটো একশ টাকার নোট আতিককে দিয়ে বললো, এটা রাখো।
আর চুপ থাকতে পারলাম না। বললাম, টিকেট দুটোর দাম দুইশ সত্তর টাকা আর আপনি দিচ্ছেন দুইশ টাকা।
লোকটি বললো, আরে রাখো রাখো, আমি ছাড়া কেউ এ টিকেট নেবে না। জাল টিকেট মনে করবে।
তখনই লোকটার হাত থেকে টিকেট দুটো নিয়ে টাকা ফেরত দিয়ে বললাম, সবাই আপনার মতো মূর্খ নয় যে ট্রেনের টিকেট জাল মনে করবে। এ বলেই চলে এলাম আর সিদ্ধান্ত নিলাম দুইশ সত্তর কেন দুই হাজার সত্তর টাকা কেউ দিতে চাইলেও টিকেট দুটো বিক্রি করবো না।
চেয়ার কোচের একদম মাঝখানের চারটা সিট ছিল আমাদের। ট্রেনে উঠেই নিজ স্থানে গিয়ে দুটো চেয়ারে দুজনের ব্যাগ রাখলাম আর দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসলাম। ব্যাগ থেকে একটা উপন্যাসের বই বের করে পড়তে লাগলাম। আতিক দুটো সিগারেট জ্বালিয়ে একটা আমার আঙ্গুলে ধরিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছুটলো গন্তব্যের উদ্দেশে। আমরা ছুটলাম লাকসামের উদ্দেশে। বিদায় হলো সিলেট স্টেশন ও সিলেট।
আমাদের পাশের সিটের জানালায় একটা মেয়েকে হেলান দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে দেখছি। মোটামুটি সুন্দরী বলা যায়। কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আড় চোখে তাকে দেখছিলাম। হঠাৎ চোখে চোখ পড়তেই আর ফেরাতে পারলাম না দৃষ্টিকে। একদম অপ্রস্তুত অবস্থায় বললাম, এনি প্রবলেম? সে বললো, সামথিং ইজ... ;
হাসি দিয়ে বললাম, আমিই কি সে সমস্যার কারণ?
মেয়েটি গুটি গুটি পায়ে এসে বললো, আগে আপনার পাশে একটু বসি?
আমি বললাম, অবশ্যই! অবশ্যই! কেন নয়?
মেয়েটা জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, পা দুটো একদম অবশ হয়ে আসছিল। তারপর বললো, আসলে পা দুটো এতো বেশি ব্যথা করছিল যে এটাই আমার সমস্যা ছিল, কিছু মনে করেননি তো?
এরই মাঝে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তার নাম খুশি। সিলেটে নানাবাড়ি বেড়াতে এসেছে। তারা তিন বোন আর ফুপি আজ ফিরবে তাই টিকেটও করা হয়েছিল চারটি কিন্তু হঠাৎ সিদ্ধান্তে তার নানুও সঙ্গে চলে এসেছে। পাচজনের মধ্যে সবার ছোট হওয়াতেই তার ওপর কর্তৃত্ব খাটিয়ে দাড় করিয়ে রেখেছে। সে এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। বয়সে তার থেকে কমপক্ষে দু বছরের বড় হবো জেনেও সে প্রথমেই আমাদের দুজনের কাছ থেকেই তুমি সম্বোধন করার অনুমতি চেয়ে নিল। সে বললো, দেখ আমি আখাউড়া যাবো। কমপক্ষে পাচ ঘণ্টা এক সঙ্গে কাটাবো, আপনি শব্দটা থাকলে কেমন যেন দূরত্ব কাজ করবে। আর তুমি বললে খুব মজা করা যাবে।

আমি আর আতিক অনুমতি না দেয়ার কোনো কারণ দেখছিলাম না, তাই শুরু হলো একটা জমজমাট গল্পের আসর। যদিও আতিক অধিকাংশ সময়ই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আড্ডা শেষে একটা সিগারেট জ্বালালাম। খুশির অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু কেন যেন অনুমতি নিতে ইচ্ছা করছিল না। তাই অভদ্র কাজটা করেছিলাম। খুশি অবশ্য বলেই ফেললো, এটা না খেলে হয় না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, ও সরি, সরি। আচ্ছা তুমি আর আতিক গল্প করো আমি না হয় দরজার কাছে গিয়ে শেষ করে আসি।

খুশি কেবল একটু হাসি ঠোটে ফোটালো। তা দেখে বোঝার উপায় ছিল না এটা কি সম্মতির নাকি...।

মিনিট পাচেক পরে ফিরে এলাম। দেখি আতিক আমার জায়গা দখল করে খুশির পাশে বসে গভীর গল্পে মগ্ন। তার কথা বলা দেখে আমার খুব লজ্জা হচ্ছিল। সে এমন ভাবে কথা বলছিল যে, আমার মনে হচ্ছিল এতোক্ষণ তাকে আমি দড়ি দিয়ে বেধে রেখেছিলাম তাই সে কথা বলার সুযোগ পায়নি। আমি কখন এসেছি তারা খেয়ালই করেনি। তাদের গল্প শুনতে শুনতে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর আমার ঘুম ভাঙলো। জেগে দেখি আতিক ও খুশি নীরব হয়ে বসে আছে। আমার নীরব থাকতে একদম ইচ্ছা করছিল না। খুশিকে বললাম, এসো গল্প করি। খুশি যেই উঠে আসতে লাগলো আতিক তার হাত চেপে ধরলো। আতিকের সাহস দেখে কিঞ্চিৎ অবাক হলাম। কিছু বললাম না।

সে বললো, বসো, কথা আছে।

বাধ্য মেয়ের মতো খুশি বসে পড়লো। আতিক কিছুক্ষণ পর খুশির হাত আবার ধরে বললো, খুশি, আমি কি তোমার হাতে হাত রেখে আগামী দিনগুলোতে পথ চলতে পারবো?

খুশি চুপ করে রইলো। আতিক বললো, উত্তর চাইছি হ্যা অথবা না। খুশি তারপরও কিছু বললো না।

আতিক এবার একটা সিগারেট ধরাতেই খুশি বললো, এটা ফেলো, তা না হলে কোনো উত্তরই পাবে না।

আতিক সিগারেট ফেলছে না দেখে খুশি নিজেই তার ঠোট থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল।

অনেকক্ষণ পর খুশি আমাকে বললো, তোমার কাছে কি কাগজ কলম হবে?

আমি বের করে দিলাম। খুশি অনেক সময় নিয়ে কি যেন লিখলো। তারপর আমাকে দিয়ে বললো, সামনেই আখাউড়া ষ্টেশন। আমি নেমে যাবার পর তুমি আতিককে এটা দেবে, ঠিক আছে।

আমি মাথা নাড়লাম। মিনিট পাচেকের মাঝেই ট্রেন ষ্টেশনে পৌছালো। খুশি তার পরিবারের সঙ্গে নেমে যেতেই আতিককে কাগজটা দিয়ে বললাম, পড়ে দেখ, কি লিখেছে।

আতিক বললো, তুই পড়ে শোনা।

আমি পড়তে লাগলাম :

আতিক,

তোমাকেই বলছি, শুনতে পাচ্ছো? আমি নিজেকে সবসময় লাকি পারসন ভাবতাম কারণ, সৃষ্টিকর্তা কখনোই আমাকে কঠিন কোনো কাজের মুখোমুখি করেননি। আজ করলেন। কিন্তু তার জন্য একদম অপ্রস্তুত ছিলাম। তবে কি উত্তর দেবো ভেবেই পাচ্ছি না। একটা কথা সত্য যে, তোমার কথাগুলো যতোবারই আমার কানে বেজে ওঠে ততোবারই আমি সুখের সাগরে ভাসি। এরই নাম কি প্রেম?

নিচে মোবাইল নাম্বার দিলাম, কথা হবে আবার। শুভেচ্ছান্তে

খুশি

০১৭১–সসসসসস

চিঠিটা শেষ হতে না হতেই আতিক হুররে বলে লাফিয়ে উঠলো। ট্রেন চলা শুরু হলো। আতিক জানালা দিয়ে মাথা বের করে দেখে খুশি এখনো দাড়িয়ে আছে। আমার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে সে চুমু খেতে লাগলো। খুশি তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানালো। আতিকও হাত নেড়ে বিদায় জানাতে লাগলো তাকে।

ট্রেন দ্রুত চললো। স্টেশন পার হয়ে এসেছি। খুশিকে দেখা যাচ্ছে না, তারপরও আতিকের হাত নাড়ানো বন্ধ নেই।

ঘুটঘুটে অন্ধকার দিয়ে ট্রেন ছুটে চলছে হঠাৎ আতিকের হাত থেকে কাগজটা উড়ে গেল বাতাসে। আতিক চিৎকার দিয়ে উঠলো। কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মাথায় এলো চেইন টান দেয়ার জন্য। কিন্তু ততোক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। আমি আতিককে জড়িয়ে ধরে রাখলাম। তাকে চেইন টানতে দেইনি কারণ এখন টানলে কোনো লাভ হবে না। এ অন্ধকারে কোথায় খুজবো কাগজটা। ট্রেনও এতো দ্রুত ছুটছিল যে, ট্রেনটাও অনেক দূরে চলে এসেছে। কিছুক্ষণ মানুষের ভোগান্তি ছাড়া কিছুই হবে না। আতিক আমাকে জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগলো। মোবাইল নাম্বার খেয়াল করার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই মনে আসছিল না। আমি আতিককে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম না। কারণ তার কেদে কেদে একটু হালকা হওয়া প্রয়োজন ছিল।

সুখ এবং দুঃখ, এ দুটো যে খুব কাছাকাছি বাস করে সেদিনের ঘটনাটা আমাকে শিক্ষা দিয়ে গেল। তা না হলে আতিক যখনই সুখটাকে কাছে পেল দুঃখ তখনই তাকে জড়িয়ে ধরলো। আসলে আমাদের চোখের সামনেই সুখ–দুঃখ একই বৃন্তে বাস করে।

লাকসাম থেকে

বন্ধুত্ব

অনামিকা

প্রথমেই দার্শনিক এরিস্টটলের বাণী দিয়ে শুরু করছি। বন্ধু কি? দুটি দেহের মধ্যে অভিন্ন একটি হৃদয়। সত্যিই তাই! এরিস্টটলের সঙ্গে একমত পোষণ করে আমি বলছি– Friendship is the rainbow between two hearts. Sharing of 7 feelings= Love+ Sad+ happy+ Truth+ Secret+helping=Friendship। সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা সবকিছু যে বন্ধু শেয়ার করতে পারে সেই প্রকৃত বন্ধু। বর্তমান যুগ এমন একটি যুগ যেখানে প্রকৃত বন্ধু পাওয়াটা কষ্টসাধ্য। বলতে গেলে সাধনার ধন।

মানুষ সামাজিক জীব। এটা সবাই জানি। সমাজ জীবনে চলতে গেলে একজনের আরেকজনের সহায়তার প্রয়োজন হয়। সেই সহায়তা থেকেই বন্ধুত্বের সৃষ্টি। কেউ চাইলেই বন্ধুত্ব তৈরি করতে পারে না। বন্ধুত্ব আপনাআপনিই হয়ে যায়। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে বন্ধুত্বটা আরো বেশি গড়ে উঠছে। মোবাইল–ইন্টারনেটের মাধ্যমে আজকাল অসংখ্য বন্ধু তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে নারী–পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্বটা খুব দ্রুত গড়ে উঠছে। এর সবই কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রযুক্তি দ্বারা যে বন্ধুত্বটা তৈরি হয় সেটা শতকরা ২০ ভাগ দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধুত্বে পরিণত হয় আর বাকি ৮০ ভাগই ক্ষণস্থায়ী ।

ভূমিকাটা একটু বড় হয়ে গেল। এবার মূল গল্পে আসা যাক। গল্পটা আমার এক বন্ধুর। সে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। ধরে নিচ্ছি তার নাম ম। সে একটু কল্পনাপ্রবণ। যা কল্পনায় আসে তা একটু দেরিতে হলেও বাস্তবে রূপ দেয়। তার কোনো ছেলে বন্ধু ছিল না। তবে আশা করে ছিল এবারের বন্ধু দিবসে তার একজন ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে। দেখতে দেখতে বন্ধু দিবস এসে গেল। ম–এর কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো না। হতাশ মনে বাসায় ফিরে এলো। আগস্টের প্রথম রবিবার বন্ধু দিবস। শনিবার শেষ হয়ে গেল রাত ১২টায়। ১২টা ১ মিনিট থেকে শুরু হলো রবিবার অর্থাৎ বন্ধু দিবস।

রাত দুইটায় হঠাৎ করে মোবাইলটা বেজে উঠলো, ঘুম চোখে সে ফোন রিসিভ করলো। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো অচেনা কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বরটি ছিল একটি ছেলের। ওই দিন মোবাইলে চার্জ না থাকার কারণে কোনো কথা বলা হয়নি। বার বার লাইন কেটে যাচ্ছিল। তাই মোবাইল বন্ধ করে চার্জে দেয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। সকালে ঘুম থেকে উঠে ওই নাম্বারে মিসকল দিল অজানা এক কৌতূহলে। কিন্তু অপর

প্রান্ত থেকে কোনো প্রতিউত্তর পেল না। হতাশ মনে কলেজে গেল। ভেবেছিল কলেজে হয়তো কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে, না সেখানেও হলো না। বাসায় এসে আবারও মিসকল দিল, হ্যা এবার উত্তর পাওয়া গেল। সামান্য একটু কথাবার্তা হওয়ার পর ছেলেটি বন্ধুত্ব করার প্রস্তাব করলো। ম অমত করলো না। কারণ এখানে তার কল্পনা বাস্তবে রূপ লাভ করছে। তাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার বন্ধুটির নাম ক। সে সমাজ বিজ্ঞানে মাস্টার্স পড়ছে জ.বি–তে। প্রথম দিকে ছেলেটির বেশি আগ্রহ ছিল। প্রতিদিন মেসেজ পাঠাতো, ফোন করতো এবং ম–কে প্রতিদিন মেসেজ পাঠাতে বলতো। এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পরই ছেলেটি ম–এর সঙ্গে দেখা করতে চাইলো। ক এবং ম–এর বাড়ি একই জেলাতে। ম–এর তেমন আগ্রহ ছিল না দেখা করার ক্ষেত্রে। তারপরও সে রাজি হয়েছে দেখা করার জন্য, কেননা বন্ধু যদি বন্ধুর কথা না রাখে তাহলে সে আবার কিসের বন্ধু। জেলা গ্রন্থাগারে তারা দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল। সকাল ১০টায় তারা সেখানে থাকবে। সেদিন বৃষ্টি ছিল। থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই কাকভেজা হয়ে সেখানে পৌছালো। ম পৌছার আধঘণ্টা পর ক সেখানে পৌছে। দুজন দুজনকে দেখলো, হালকা কিছু কথাবার্তা হলো। ম তার মনের কথা খুলে বলতে পারে না। কিন্তু লিখতে পারে। সে ক–এর সঙ্গেও সব কথা খুলে বলতে পারে না। তাই সে ক–কে চিঠি লিখতে চায়। চিঠি লিখে কিন্তু সে চিঠি ক পর্যন্ত পৌছায় না। আর পৌছাবে কি করে? চিঠি পৌছাতে ঠিকানার প্রয়োজন হয় কিন্তু ম–এর কাছে ক–এর কোনো ঠিকানা ছিল না। তাই ম ক–এর কাছে ঠিকানা চেয়েছিল। কিন্তু সে তার ঠিকানা দেয়নি বরং বলেছে মেসেজ লিখতে। মনের সব কথাই কি মেসেজে লিখা যায়? আবারও ক–এর ইচ্ছাতেই ম–এর সঙ্গে ওই গ্রন্থাগারেই তাদের দ্বিতীয়বার দেখা হয়। সেই দিন ম ঠিকানা চাইলে ক তার ঠিকানা লিখতে গিয়ে ম কে লিখেছিল আমার ঠিকানা তুমি। তাদের বন্ধুত্বটা তখনো ততো গভীরে পৌছায়নি। তারপর কিছু দিন ভালোই কাটে।

তার পরের ঘটনাগুলো ম–এর জন্য দুঃখজনক। ক আর আগের মতো ফোন করে না, মেসেজ পাঠায় না। ম নিজেই ফোন করে। ম–এর সঙ্গে ক–এর দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল। ম মেসেজ পাঠালে ক নাকি তা পায় না। অথচ ওই নাম্বারে ফোন করলে ক–ই রিসিভ করে। ম বিশ্বাস করতে পারে না যে ক তার সঙ্গে মিথ্যা বলছে। ক আর ম–কে ফোন করে না। কিন্তু ম ক–এর সঙ্গে রাগ করে থাকতে পারে না। আবারও ফোন করে। ক–এর কথাগুলো ম–এর খুব ভালো লাগে। তাই অধীর আগ্রহ নিয়ে ক–এর কথা শোনার অপেক্ষায় থাকে। ম খুব সহজ সরল একটি মেয়ে। কোনো রকম ভণিতা সে পছন্দ করে না। ম ক–কে অনেক বিশ্বাস করে। কখনো ক–এর কোনোরকম অমঙ্গল আশা করে না। সর্বদাই আল্লাহর কাছে ক–এর মঙ্গল প্রার্থনা করে। ম–এর বিশ্বাস ক একদিন তার খুব ভালো বন্ধু হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

দিন লুববি

শহীদুল ইসলাম

কি বিচিত্র মানুষের জীবন! তার জীবদ্দশায় পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকে নানা ঘটনার সমাহার। শিশু জাদুকর কবিতার রূপকথার মতোই আমার এ গল্প। এই গল্পের নায়ক অমিত। ছোটবেলায় সিনেমার নায়িকাকে ভালো লাগতো।পুনম ধীলন–কে নিজের খাতায় পেন্সিলে আকার চেষ্টা করতো। বয়ঃসন্ধিক্ষণে সেন্ট প্যাকটিস স্কুলে তারই এক ক্লাস নিচে পড়ুয়া একটি মেয়েকে খুব ভালোবাসতে শুরু করলো। নতুন কুড়িতে পুরস্কার জিতে আজ মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত গায়িকা। আমরা তার নাম দিলাম রানী। রানীকে তার ভালো লাগার কথা কখনোই বলতে পারেনি।

শুধু দূর থেকে দেখা, স্বপ্ন। অথচ রানী প্রেম করতো মহল্লার মাস্তান রমিজের সঙ্গে। রমিজের একটি চোখ নষ্ট ছিল। সেখানে বসানো ছিল পাথরের চোখ। কিভাবে যে রানীকে পাথরচোখা বশ করেছিল! অবাক লাগে ওই স্কুলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে ভালোবাসতো মাস্তান রমিজের আরেক বন্ধু কালুমাস্তান । সুন্দরী

কৈতরির সঙ্গে কালু মাস্তানের সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়। আবার ছাড়াছাড়িও হয়। কৈতরি বর্তমানে বিটিভি–র ইংরেজি খবর পাঠিকা। জানি না কেমন আছে, কিভাবে আছে।

স্কুল জীবন শেষ করে অমিতকে পারিবারিক কারণে ঢাকা থেকে মফস্বলের একটি শহরে চলে যেতে হয়। সেখানে কলেজে ভর্তি হয়। ঘটনাক্রমে পাশের বাসার টুম্পার সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক হয়। একজন আরেকজনের জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারে, এ রকম গভীর তাদের প্রেম।

অমিত শ্যামাঙ্গী টুম্পাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতো। মাঝে মধ্যে কবিতা লিখতো

মমতাজ তুমি হবে আমার, রইবো অপেক্ষায়

সোনালি এক বাসর গড়ার মধুর প্রত্যাশায়।

কিন্তু পারিবারিক শাসনে অপরিপক্ব কিশোর–কিশোরীর ভালোবাসা কুড়িতে বিনষ্ট হয়ে যায়। দুই বছর স্থায়ী ভালোবাসাবাসি সমাপ্তির রেখা টানে। ছোট শহর, পরিবারের কড়া শাসন তাদের তিনটি বছর বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এই তিন বছরে মাঝে মধ্যে শিলা, ইলা, রিনার মতো কেউ কেউ আসে ভালোবাসার ডালি নিয়ে। অমিতও তাদের সঙ্গে হ্যা/না/ঠিক আছে ইত্যাদি সম্পর্ক গড়ে। শিলা, ইলা, রিনারা অমিতের কাছ থেকে জানতে পারে তারা শুধু কষ্ট করছে, অমিতের হৃদয় জুড়ে আছে শুধু টুম্পা। এর মাঝে ইলা অমিতের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শামিমের সঙ্গে প্রেম করে। অমিতকে দেখিয়ে শামিমের সঙ্গে ডেটিং করে কলেজ ক্যাম্পাসে। ক্যাম্পাসে অমিতকে দেখানোর জন্য শামিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লেপটে থাকে। একদিন ইলা নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করে শামিমকে। ইলার পরিবার এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। জোর করে ইলাকে নিয়ে এসে ঢাকায় তার মামার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

অমিত এমনিতেই চাপা এবং ভীরু স্বভাবের। কোনো কারণে কেউ তাকে মন্দ ভাবুক এমন অপবাদের শরিক হতে চায় না। তবে সে মাঝে মধ্যে বাসার ব্যালকনি অথবা জানালার পর্দা সরিয়ে বসে থাকে, যদি এক মুহূর্তের জন্য সামনের বাসার টুম্পাকে দেখা যায়। প্রথম যখন টুম্পা ও অমিতের সম্পর্কের খবর কেউ টের পায়নি তখন তারা প্রতিদিন ভোরে হাটতে বের হতো। টুকটাক করে নিজেদের স্বপ্নের কথা, চিঠি চালাচালিও চলতো ওই সময়। এক সময় ধরা পড়ে যায় অভিভাবকের কাছে, বন্ধ হয়ে যায় স্বাধীনতা। টুম্পাকে সব সময় চোখে চোখে রাখা হয়।

একদিন হঠাৎ অমিতরা বাসা পরিবর্তন করে শহরের অন্যদিকে চলে যায়। সকালে আগে যখন টুম্পাকে নিয়ে ঘুরতে বের হতো কলেজ মাঠের দিকে, একটি বৃক্ষ কতো কাল ঠায় দাড়িয়ে আছে তার ছায়ায় বসতো তারা। মাঝে মধ্যে অমিত সেখানে গিয়ে বসে থাকে, অতীতের জাবর কাটে।

এক সময় অমিতকে দেশ ছেড়ে পড়াশোনা করতে বিদেশে যেতে হয়। পারিবারিক সম্মতিতে টুম্পাও বিয়ের পিড়িতে বসে।

অমিতের পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাত্রা যেমন অনন্তকাল ধরে সূর্যেরও সে পথ। সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়। অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অস্তলোকের খোজে বের হয়ে পড়ে। বিদেশে প্রথম এক বছর কাটে খুবই কষ্টে। তার মধ্যে ভাষাগত জটিলতা তো আছেই। এরপর যখন জানতে পারলো তার মানসপ্রিয়া শ্যামাঙ্গী অন্য কারো হয়ে গেছে, ভীষণ ধাক্কা খেলো। মাঝে মধ্যে তাই তো খরস্রোতা নিপর পাড়ে এক মনে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, ওই যে নদী যায় সাগরে কতো কথা শুধায় তারে, এতো জানে তবু নদী কথা বলে না।

উইক এন্ডে গৃদ্র পার্কের গাছের ছায়ায় বসে পিভা পানের পর আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু বলে, ভালো আছি ভালো থেকো।

সময় ও স্রোতের মতো অমিতের জীবনেও তানিয়া, নাতাশা, কাথিয়া, লিয়েনারা আসে, চলে যায়।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম, বসন্তের শ্যামল সবুজ নগরী। শরতে পাতা ঝরা, রক্ত ঝরা শহর আর শীতের শাদা বরফের পবিত্রতা। এ দেশের আবহাওয়ার মাঝেই নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ঘরকুনো লাজুক

প্রকৃতির অমিত হয়ে ওঠে বাচাল, দুঃসাহসী। কাউকেই ভালোবাসতে পারে না স্থায়ীভাবে। সময়, আবহাওয়া পরিবর্তনের মতো তার ভালোবাসা বা ভালো লাগারও পরিবর্তন হতে থাকে।

এর মাঝে তাকিয়ে দেখে একজন পিছু ছাড়েনি। লারিসা নামের রুশ কিশোরী পাচটি বছর আঠার মতো লেগে ছিল তার সঙ্গে। কখন নেশার ঘোরে বেহুশে টুম্পার কথা বলেছিল ওই মেয়েটিকে, সেও চেষ্টা করেছে অমিত যেন টুম্পার কথা পুরোপুরি ভুলে তাকে নিয়ে সুখী হয়, ঘর বাধার চেষ্টা করে।

বিদেশে এসে নাতাশা, তানিয়া ও লারিসাদের কাছ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি উপহার ও শুভেচ্ছা পেয়ে জানতে পারলো ভ্যালেনটাইনস ডে সম্পর্কে যাকে রুশ ভাষায় বলে দিন লুববি।

লারিসা অমিতকে ভীষণ ভালোবাসতো। সে সব সময় চেষ্টা করতো তার কাছাকাছি থাকতে। এমনকি নিউ ইয়ার বা নবইগোদ দিন লুববিতে অমিত যদি কোনো কারণে তিন হাজার মাইল দূরেও থেকেছে ঠিক সে হাজির হয়েছে।

কোনো এক ভ্যালেনটাইনস ডে'তে অমিতকে কাজে উত্তর মেরুর শহর মুর মাংসনকে কয়েক সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল। কোনো আগাম নোটিশ না দিয়ে লারিসা ৫০ ঘণ্টা ট্রেন জার্নি করে কিভ মুর মাংসনক–এর রেল স্টেশনে এসে ১৪ ফেব্রুয়ারি সকালে ফোন করে বলছে, আমি স্টেশনে, আমাকে নিয়ে যাও।

এ রকম হঠাৎ অবাক করে দেয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল লারিসার। কখনো কৃষ্ণ সাগরের মাঝে জাহাজে অথবা কারপাত পর্বতমালার ঝরনার প্রস্রবর্ণের অমিতের বুকে মাথা রেখে পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে লারিসা বলেছিল, ভালোবাসি এবং ভালোবাসি।

কিন্তু অমিত সুদূরপ্রসারী চিন্তায় ডুবে যায়। বাইরের দুনিয়ার হাতছানি, অন্যদিকে স্বদেশী সমাজের তাড়না – সেদিন দুই–ই ছিল সক্রিয়।

উপসংহার : কোনো কারণে টুম্পার বিয়ে টেকেনি। দীর্ঘ ১১ বছর পর টুম্পা–অমিতের বিয়ে হয়েছে। তাদের চাদের মতো ফুটফুটে একটি সন্তান আছে। ভীষণ সুখী তারা।

এদিকে লারিসা স্বামী, সন্তান নিয়ে সুখে আছে। অমিতের সঙ্গে ভ্যালেনটাইনস ডের শুভেচ্ছা বিনিময় না হলেও জন্মদিন ও নববর্ষে টেলিফোনে একজন অন্যজনকে উইশ করে।

দিন লুববি–তে অমিত এখন শুধু উইশ করে তার টুম্পাকে। ওই দিনটার খুব কাছাকাছি ১৭ ফেব্রুয়ারিতে এসেছিল তাদের নতুন লুভব (ভালোবাসা) সন্তান।

নোভারা, ইটালি থেকে
Shakhidul@yahoo.com

বাবা

রেজাউল করিম

আমার প্রয়াত বাবা ছিলেন একজন পেশাদার আইনজীবী। ত্রিশ বছর তিনি চট্টগ্রাম কোর্টে ওকালতি করেছেন। আমার জন্মের পাচ বছর আগে থেকে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। বাবা যদিও দীর্ঘদিন পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন তবুও তার এ পেশাকে আমি মনে প্রাণে মানতে পারতাম না। কারণ স্বাধীন ব্যবসা হলেও এ পেশা আমার কাছে খেটে খাওয়া মানুষের পেশা বলে মনে হতো। তদুপরি জীর্ণশীর্ণ দেহে চট্টগ্রাম কোর্টের খাড়া পাহাড়ে চড়াই–উতরাই করে যে অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি করতেন, যে সততা ও নীতি মেনে ওকালতি প্রাকটিস করতেন তাতে তার অন্য উকিল বন্ধুদের তুলনায় ওই পেশায় বেমানান মনে হতো।

কোর্টকে আমার কাছে কেন জানি কুচক্রী ও অপরাধীদের আড্ডাখানা মনে হতো। এখানে বাদী–বিবাদী সবাইকে প্রথম থেকে সন্দেহের আবরণে ঢেকে রেখে বিচার কাজ পরিচালনা করা হয়। কোর্টে বিচার কাজে নিয়োজিত বা বিচারকদের কাজে সহায়তাদানকারী সবাইকে আমার কাছে প্রতারক ও ঘুসখোর বলে মনে

হতো। সুবিচারের আশায় এখানে এসে খুব কম লোকই সুবিচার পেয়ে ধন্য হয়েছে। সুবিচার চাইতে এসে এখানে নাস্তানাবুদ ও নাকানি-চুবানি খেয়ে ভবিষ্যতে এ পথ মাড়াতে না হয় এমন তওবা করে অনেককে ফিরে যেতে দেখেছি।

এ রকম পরিবেশে আমার ধর্মপ্রাণ, সৎ ও সহজ সরল বাবাকে অনেক কষ্টে মানিয়ে চলতে হতো। ওকালতি পেশায় নিয়োজিত থেকেও তিনি নিজ গ্রামের বাসিন্দাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করে কোর্টে যেতে বারণ করতেন। আমার কাছে এ পেশাকে তার জন্য উপযোগী নয় বলে মনে হতো। তাই বাবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ওকালতি পড়তে উৎসাহ পাইনি। বাবার এই কষ্ট আমার সহ্য হতো না।

এতো কষ্টের মাঝেও বাবা উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার জন্য আমাকে বার বার তাগাদা দিতেন। কলেজে পড়তে গিয়ে প্রথম দিকে এমন তাগাদা মানতে পারতাম না। বাবার বিরুদ্ধে মায়ের কাছে নালিশ করতাম। মা অতি শান্ত কণ্ঠে বুঝিয়ে দিতেন, বাবা আমাকে ভালোবাসেন এবং আমার ভালো চান তাই এমন করেন। এর বিপক্ষে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। তখন বুঝে নিতাম মায়ের কাছে বাবার বিরুদ্ধে বলে কোনো লাভ হবে না। কলেজ জীবনে দু-এক বছর খারাপ করার পরও নাছোড়বান্দা বাবার তাগিদে আমি ইউনিভার্সিটির গণ্ডি পার হতে পেরেছি।

তবে যেদিন ইউনিভার্সিটির চৌকাঠ পার করেছিলাম সেদিন বাবার যে কি আনন্দ হয়েছিল তা আজ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। বাবার তাগাদার মূল্য তখন বুঝতে পেরেছিলাম। পাস করার পর পরই চাকরি পেয়ে বাবাকে আর কোর্টে যেতে দিইনি। তারপরও শেষ জীবনের দশটা বছর বাবাকে সেবা করার জন্য পেয়েছি।

আজ থেকে পয়ত্রিশ বছর আগে আমিও পুত্র সন্তানের বাবা হয়েছি। বাবার মতো আমারও আশা ছিল পুত্রদের উচ্চ শিক্ষিত করবো। তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিদেশে রেখে উন্নত বিশ্বের আবহাওয়ায় শিক্ষাদান করতে চেয়েছি। তার জন্য আমিও বাবার মতো তাদের মানুষ হবার তাগাদা দিয়েছি।

কিন্তু তারা আমার তাগাদার বিপক্ষে আমার মতোই তাদের মায়ের শরণাপন্ন হয়েছে। তাদের মা আমার মায়ের মতো তাদের বাবার ভালোবাসার কথা বলে সুপরামর্শ না দিয়ে বিপথে চালিত করতো। তাই তারা আজ এতো বয়সেও নিজেদের সমাজে সুশিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বাবলম্বী করতে পারেনি।

বাবা ও আমার মধ্যে ভালোবাসার এই পার্থক্যটাই শেষ জীবনের পাওনা হিসেবে মেনে নিচ্ছি।

তারপরও যদি শুনি, এই বুড়া এখনো মরছে না কেন তাহলে বাচবো কি নিয়ে!

চট্টগ্রাম থেকে
skyad@spctnet.com

অপরিচিতা

মোশফেকুন নিগার

পড়াশোনার চাপ ছোটবেলা থেকে এতোটাই ছিল যে, কবে ভালোবাসা দিবস আর কবে বিজয় দিবস মনেই থাকতো না। ভালোবাসা দিবস, বিজয় দিবস এমন আরো অনেক কিছুই মনকে ছুয়ে যেতে পারেনি শুধু ক্যারিয়ার গড়ার কারণে। যখন জীবন গড়া শেষ পর্যায়ে তখন লন্ডন থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলাম। দেশে ফিরেই বুঝলাম ১৪ ফেব্রুয়ারির ভালোবাসা দিবস বেশ ঘটা করেই পালিত হয় বাংলাদেশে।

১৪ ফেব্রুয়ারি সলিমুল্লাহ মেডিকাল কলেজের বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বুড়িগঙ্গায় নৌকা ভ্রমণের জন্য সবাই মিলে গেলাম। যারা এখনো প্রেমে পড়েনি বা প্রেম করে না এ রকম বারো তেরোজন মিলে যাত্রা শুরু করলাম। সেখানে দুটি মেয়েও ছিল। একটু অবাকই হলাম। পরে শুনলাম তারা ৫ম চণটর-এ পড়ে। বন্ধু

সালাম–এর কাজিন একজন, আরেকজন কবিরের ভাগ্নি। ভাবলাম এ দুইজন হয়তো একটু দোলা দিলেও দিতে পারে। খাওয়া দাওয়ার ফাকে হাই– হ্যালো, একটু জানাশোনা, কথা বলা চলছিল।

ছন্দাকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগেছিল। এমনিতেই আমার বয়স বেশি হয়েছে। তাই মেয়েদের বেশি কোয়ালিটি দেখে লাভ নেই। কারণ নিজের দিকেও তো তাকাতে হবে।

তিন মাস প্রেম করলাম। ওই হাত ধরা পর্যন্তই। কিস করতে ইচ্ছা হয়নি। কারণ ভেবেছি আমার বৌ তো হবেই, তখন সারা জীবন কিস করা যাবে তাকে।

বাবা–মাকে এক সময় জানালাম। সব পক্ষ থেকেই ইতিবাচক সাড়া আসায় বিয়ের দেরি হলো না। ঠিক সময়ে বিয়ের কবুল পড়লাম।

বাসর রাতের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এলো যখন চুমুর গভীরে প্রবেশ করলাম এবং শেষ পর্যন্ত যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

ছন্দা বললো তার একটু প্রবলেম আছে যেটা অপারেশন করলেই ভালো হয়ে যাবে।

হতবাক হয়ে গেলাম, কি এমন প্রবলেম? আমি প্রকৌশলী মানুষ, কলকব্জা নিয়ে কারবার। কিন্তু সে তো ডাক্তার, নিজের প্রবলেম তো বুঝবে।

সাত দিন পরে যখন আবারো চুমুর আলিঙ্গন শেষ করে যেতে চাইলাম, একই অনুরোধ এলো ছন্দার কাছ থেকে।

বললাম, কি এমন সমস্যা আমাকে বলো এবং দেখাও। আমি তো তোমার স্বামী।

ছন্দার অনেক আপত্তি সত্ত্বেও যখন সব কিছু খুলে দেখলাম তখন মনে হলো মেয়েরা প্রেম করে, ছলনা করে, অন্যকে বিয়ে করে। কিন্তু ছন্দা আমার সঙ্গে এটা কি করেছে? সে ডাক্তার, নিজেকে বোঝে। সে নিজের এ অপূর্ণতাকে ঢেকে কেন আমার সঙ্গে তিন মাস প্রেম করলো? কেন আমাকে বিয়ে করলো? কেন আমার জীবনটা নষ্ট করলো?

পাঠক, নিশ্চয়ই আপনাদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে তার অপূর্ণতাটা কি? হ্যা, খুব কাছে থেকেও আমি বুঝিনি। কারণ বোঝা যায়নি। ছন্দার নিচের পারশন ছেলেও না, মেয়েও না। আমাকে হারানোর ভয়ে কিছু জানায়নি। বুঝলাম তার মনের অবস্থা।

প্রতিদিন ইন্টারনেটে ব্রাউজ করি কোথায় ভালো ট্রটমেন্ট করে। কোথায় নিয়ে গেলে ছন্দাকে একজন পরিপূর্ণ রমণীরূপে দেখতে পাবো। না পারি মা–বাবাকে বলতে, না পারি নিজেকে বোঝাতে, না পারি ছন্দাকে কিছু বলতে। হায়রে ভালোবাসা দিবস!

কেন সেদিন বুড়িগঙ্গায় গিয়েছিলাম নৌকা ভ্রমণে? কেন দেখেছিলাম ছন্দাকে? কেন সে আমায় এভাবে ফাকি দিল? সবাই এ দিনে ফুল বিনিময় করে, চুমু বিনিময় করে আর আমি শরীরটাই বিনিময় করতে পারছি না। হাজার শারীরিক প্রয়োজনেও ছন্দাকে ছেড়ে অন্য কারো কথা চিন্তা করতে পারি না। কাকে দোষ দেবো – ছন্দাকে, না ছন্দার সৃষ্টিকর্তাকে?

রাজশাহী থেকে

আমার পৃথিবী

মীনা খান

পৃথিবীতে সবচেয়ে যাকে ভালোবাসি সে হলো আমার মা। মায়ের ভালোবাসার মতো নিঃশর্ত ভালোবাসা পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।

আমার বয়স যখন চার এবং ভাইয়ার বয়স ছয় বছর তখন দাদাবাড়ির পুকুর পাড়ে আমার সমবয়সী কয়েকজনের সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ পুকুরে পড়ে যাই। হাবুডুবু খাচ্ছি দেখে আমার ভাইয়া চিৎকার করে আম্মাকে ডাকেন। আম্মা ভাইয়ার চিৎকার শুনে পড়িমরি করে এসে পুকুরে ঝাপিয়ে পড়ে আমাকে

তুলে আনেন। তারপর আমায় জড়িয়ে ধরে মায়ের সে কি কান্না! আমি তো বেচে গেলাম কিন্তু দৌড়ে আসার সময় আম্মার পায়ে আঘাত লাগে। আঘাত লাগার ফলে আম্মার জ্বর আসে এবং সে জ্বরে তাকে রেস্টে থাকতে হয় এক মাস। ওই এক মাস আম্মা আমাকে ও ভাইয়াকে কখনো চোখের আড়াল করেননি। বেশির ভাগ সময় বুকে জড়িয়ে ধরে রাখতেন।

আম্মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক (ঈশ্বরচন্দ্র এবং তার মায়ের মতো, বন্ধুরা বলে) খুব ভালো। আমি ইউনিভার্সিটি বা যে কোনো জায়গায় বা ঘরের বাইরে যাওয়ার আগে মাকে একটা নির্দিষ্ট সময় বলে বাইরে যাই। ঠিক ওই নির্দিষ্ট সময় হলেই মা আমার পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন, কখন আমি বাসায় ফিরবো। আমার বন্ধু–বান্ধব আমাকে নিয়ে কটূক্তি করে, নানান রকম ঠাট্টা করে। আমাকে নিয়ে তারা আড্ডা দিতে চায়। কিন্তু আমার কাছে শুধুই মনে হয়, তাদের আড্ডার আনন্দের চেয়ে মায়ের সঙ্গ এবং তার কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির মূল্য অনেক বেশি। জানি, যতোক্ষণ বাসায় না ফিরবো ততোক্ষণ মা আমার পথ পানে তাকিয়ে থাকবেন এবং ছটফট করতে থাকবেন। চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়বেন।

আপনারাই বলুন, এমন মাকে কি কষ্ট দেয়া যায়? যদি আম্মা আমাদের বাসায় রেখে বাইরে কোথাও যান তবে একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে যাবেন যে এতোটার সময় বাসায় ফিরবেন।

আমরা নিশ্চিত যে, আম্মা ঠিক ওই সময়ের মধ্যেই বাসায় ফিরবেন। আম্মার সামনে যতো বাধা বা যতোই লোভনীয় অফার থাক না কেন ঠিক ওই সময়ের মধ্যে বাসায় ফিরে আসবেন নানান রকম খাবার নিয়ে। আম্মা, আমি ও ভাইয়া কি কি পছন্দ করি সেটা মাথায় রেখে নিজে হাতে বাজার করবেন।

পাঠক আপনারাই বলুন, এমন মাকে রেখে আর কাকে ভালোবাসবো?

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

গোপন কথা

সালমা সাদাত মোনা

ছোট বেলায় খুব গল্পের বই পড়তাম। ডিটেকটিভ বই–এর শার্লক হোমস ছিল আমার নায়ক। ভাবতাম এমন বুদ্ধিমান পুরুষ দুনিয়াতে হয় না, পুরুষ শ্রেষ্ঠ!

কিন্তু যেই টারজানের সঙ্গে পরিচিত হলাম আমার মন ঘর থেকে বের হয়ে টারজানের সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরতে একটুও দ্বিধা করলো না। সঙ্গী হিসেবে টারজানকে আমার খুব পছন্দ হয়ে গেল। এমন শিশুর মতো উদার মন, শক্তিধর বাহু, সুঠাম দেহ আমার চেনা জগতে ছিলো না। কিশোরী মন উদ্দাম হয়ে উঠলো। টারজান আমার ধ্যান–জ্ঞান হলো।

কিন্তু মনের প্রসারতার জন্য পরিবেশ প্রয়োজন হয়। এই পরিবেশের অভাবে বনের রাজা আর বেশি দিন আমার মনের রাজা হয়ে থাকতে পারলো না। সেখানে আস্তে আস্তে দখল করলো মোহন সিরিজ–এর দস্যু মোহন। কিন্তু দস্যু মোহন যেই তার সামাজিক জীবনে ফিরে এলো, আমার সব শ্রদ্ধা কেমন যেন পানসে মনে হতে থাকলো।

পরে বুঝতে পেরেছিলাম আমার কিশোরী মন যৌবনে পদার্পণ করে ধীরে ধীরে কখন যেন শরৎ বাবুর নায়কদের কাছাকাছি চলে এসেছে। পরিণীতার ললিতা হয়ে বহুদিন শেখরের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছি। তাদের প্রেমের গভীরতা আমার মনকে প্রেমে পড়ার জন্য তৈরি করে দিল।

আবার প্রেমে পড়লাম। এবার দত্তার নরেনের সঙ্গে। বইটা পড়ে আমি প্রেমের অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারতাম। বইটা বহু বার পড়েছি। প্রত্যেক বারই অনুভূতি তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়েছে।

যৌবনের প্রথম আমেজে যখন প্রেম নিবেদনের পাত্রের কথা ভাবছি তখন একটা ঘটনা আমার মনকে সতর্ক করছিল।

আমার এক বান্ধবী প্রায়ই ক্লাসের অফ টাইমে লুকিয়ে চিঠি পড়তো। অবশ্যই প্রেমপত্র। আমাদের দেখলেই লুকিয়ে ফেলতো।

একদিন কলেজে গিয়ে শুনি মেয়েরা কানাকানি করছে। জানতে পারলাম–বান্ধবীটি তার প্রেমিকের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করেছে। প্রেম করলে যে বাড়ি থেকে পালাতে হয় আমার জানা ছিল না।

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। না, আমার কোনো নায়ক–নায়িকার সঙ্গে মিলছে না। উল্টো কেমন যেন ভিলেইন মনে হচ্ছে।

ব্যাপারটা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য মনে হলো না। হতোদ্যম হয়ে রাতে খেতে বসে বাবাকে বললাম, জানো বাবা, আজ আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, পালিয়ে গেছে! কেন? কি হয়েছিল? কেউ বকেছে বুঝি? পালাবে কেন, হয়তো রাগ করে কোনো আত্মীয়ের বাড়ি গেছে। রাগ পড়লে আবার ফিরে আসবে।

আমি বললাম, না বাবা, প্রেম করে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে। সবাই বলছে তার বাচ্চা হবে!

বাবা চুপ করে রইলেন, মা ভ্রূকুটি করে ধমকে উঠলেন, খাওয়ার সময় এতো কথা বলতে হয় না, খেয়ে নে!

বাবা বললেন, ঘটনাটা কি তোমার ভালো লেগেছে?

না বাবা, সবাই তাদের খারাপ বলছে, আমারও খুব খারাপ লাগছে।

মাথা নিচু করে খেতে খেতে বললাম। তারপর বললাম, বাবা প্রেম করা কি খারাপ?

এবার বাবা একটু চমকালেন। বললেন, না মা, প্রেম করা খারাপ নয়। একটু চুপ করে থেকে বললেন, আরো পড়াশোনা করো, আর একটু বড় হলে তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে। তবে একটা কথা মনে রেখো– যে কাজ করলে বাবা–মাকে বলা যায় না, অথবা তোমার অপরাধবোধ হয়, সেই কাজটা অবশ্যই খারাপ।

এরপর বাবা আমাকে অনেক বই এনে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে যৌন বিজ্ঞানও ছিল।

আমি আর একটা নতুন জগতের সন্ধান পেলাম। মানুষ জন্মের রহস্য উঘাটন করলাম।

এতো বাছ–বিচার করে কি আর প্রেম করা যায়? আমাদের সময় তো আর ভ্যালেনটাইনস–ডে ছিল না। না ছিল প্রেমকুঞ্জ, না ছিলো বসে দুদণ্ড কথা বলার সাইবার কাফে, শপিং মলের পর শপিং মল, বন্ধুর হাতে হাত রেখে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ। অথবা লং ড্রাইভ–এর আনন্দ।

কানায় কানায় পূর্ণ এক বুক প্রেমময় হৃদয় নিয়ে প্রেমিক প্রেমিকাদের আনন্দ উপভোগ করি। চুটিয়ে প্রেমের কবিতা ও গল্প পড়ি। নিজের মনের মাধুরী দিয়ে নায়ক–নায়িকা পছন্দ করে নিই। পরিপূর্ণ প্রেমের আস্বাদন গ্রহণ করি।

অনুরোধ একটাই। আমার স্বামীকে এসব বলবেন না প্লিজ, সে ভারি হিংসুটে!

গৃন রোড, ঢাকা থেকে

অন্বেষণ

আমিন

আমি তাকে খুজে বের করিনি, সেই আমায় খুজে নিয়েছে। ভালোবাসতে জানতাম না, সে আমায় ভালোবাসতে শিখিয়েছে। আমি ভালোবাসা পাইনি, সে আমায় ভালোবাসা দিয়েছে। আমি অশুদ্ধ ছিলাম, সে আমায় পবিত্র করেছে।

মেয়েটি আমাকে অসম্ভব রকমের ভালোবাসা দিয়েছে। অবাক হয়েছি, মানুষ কি করে এতোটা ভালোবাসতে পারে! ধন্য হয়েছি তার ভালোবাসার মানুষ হতে পেরে।

তার নাম বলবো না। সে লজ্জা পাবে। যাহোক, আমরা একসঙ্গে পড়ি, একই কলেজে। মাত্র ৫ মাস আগে আমাদের দেখা হয়। দেখা, পরিচয় তারপর গাঢ় বন্ধুত্ব। একটু একটু করে বুঝতে পারি সে আমার প্রতি ভালোবাসা অনুভব করছে। বেশ বিচলিত হই। জীবনে একবার ভালোবাসার চেষ্টা করেছিলাম, কোনো কারণে সে ভালোবাসা আমার ভাগ্যে জোটেনি। অনেক দিন পর আমাকে কেউ ভালোবাসতে চাইছে দেখে একটু আশ্চর্য হই।

ধীরে ধীরে সে আমার দিকে ঝুকে পড়ে। ইতিমধ্যে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটিও তার প্রতি আসক্তি অনুভব করছে। কোনো এক পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধান্ত নিই তাকে ভালোবাসার প্রস্তাব দেবো।

একদিন তার সঙ্গে ঘুরতে বের হলাম। এ কথা সে কথার ফাকে বলে দিলাম, কাউকে ভালোবাসতে চাইলে আমায় ভালোবাসতে পারে। সে হয়তো এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। প্রস্তাব দেবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেল। নিজেকে খুব সুখী মনে হলো। যাক, আমাকেও তো কেউ ভালোবাসে!

এখন তার জীবনটা আমাকে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। কথায় কথায় বলে, আমি তার ব্রেন ওয়াশ করে দিয়েছি। আমাকে একদিন না দেখলে নাকি তার ভালো লাগে না। আমার সঙ্গে একদিন কথা না বললে তার সব কিছু ফাকা লাগে।

আমার জীবনটা ছন্নছাড়া ছিল। প্রতি মুহূর্তে সে আমার অগোছালো জীবনটাকে গুছিয়ে আনতে চায়। আমার কোনো কথা বা কাজে কখনোই রাগ করে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, পাছে যদি আমি তাকে ছেড়ে চলে যাই এই ভয়ে, সে আমায় হারাতে চায় না।

তার ভালোবাসার প্রতিদান কখনোই সেভাবে দিতে পারিনি। সে বলে আমি নাকি ভালোবাসতে জানি না। হয়তো ঠিকই বলে, আমি বুঝি না।

তাকে শতবার জিজ্ঞাসা করেছি, কেন আমাকে ভালোবাসলে? সে কিছুতেই জবাব দিতে চায় না। বলে, জানি না কেন তোমাকে এতো ভালোবাসলাম।

এই ঈদে সে আমাকে একটা পাঞ্জাবি দিয়েছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি কে আমায় দিয়েছে। আমাকে যেন সব সময় কাছে পাওয়া যায় সে জন্য একটেল জয়–এর সিম কিনে দিয়েছে। আরো কি যে পাগলামি করে বলে শেষ করা যাবে না।

সে আমায় বলেছে, এ জীবনে কম অফার পায়নি। তবুও কখনো কাউকে হ্যা বলেনি। আমি কেন যে তোমার কথায় রাজি হলাম? রাজি হয়েছি বলেই তো জীবনের রঙিন দিকগুলো দেখতে পাচ্ছি। আমিও হেসে বলি, প্রথম প্রেমে এমনই হয়।

নতুন বছরের প্রথম দিনে আমাকে ছোট্ট একটি চিরকুট দিয়েছে– দ্বিগুণ ভালোবাসায় আমাকে নিমজ্জিত করো।

কোনোদিন ফোনের শেষে যদি বলেছি, একটা কিস দিতে, সে একবার নয় বার বার দিয়েছে।

অবাক হয়ে আল্লাহকে প্রশ্ন করেছি, কোন পুণ্যের জন্য আমাকে এমন সুখের দোলায় ভাসালে?

আমি আমার ভালোবাসা খুজিনি। আমার ভেতর থেকে খুজে সে রঙিন ধরিত্রীর রঙ দেখিয়েছে। তার অন্বেষণ আমায় অভিভূত করেছে। অবাক বিস্ময়ে আজো লক্ষ্য করি, সত্যিকারের ভালোবাসলে ভালোবাসার মানুষকে ঠিকই পাওয়া যায় আপন করে।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে
amins-heartz@yahoo.com

নিঃশব্দ আততায়ী

ভালোবাসা এক নিঃশব্দ আততায়ী। আমাকে নীরবে ধ্বংস করে যাচ্ছে। যা আগে জানতাম না, বুঝতাম না, মানতাম না। জানলেই বা কি করতাম? পাত্তা দেইনি ব্যাপারটিকে কখনোই। আজ উপলব্ধি করছি

কারো জন্য আমার মনটা বেশ রকম চিন্তা–ভাবনা করে, তাকে অনুভব করে, তার সঙ্গে একা একা কথা বলে। প্রায়ই মনে পড়ে তার কথা যাকে ভালোবাসছি নীরবে (নাম দেয়া যাক ডালিম)। তাই জ্বলে পুড়ে মরছি আর খাটি হচ্ছি। কাউকেই পাত্তা দেই না এ ব্যাপারে তার কথা মনে করে। কিন্তু সে তো জানে না যার জন্য এতো জ্বলুনি পুড়ুনি। তাই তো কোনো সমাধান পাচ্ছি না, শুধু পুড়ছি। জানবেই কি করে, তারই মাথা ছুয়ে আমি বলেছিলাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি না। আসলে তখনো তাকে ভালোবাসতে পারিনি।

অল্প কয়েক দিনের পরিচয় কথাবার্তায় কি সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা জন্মায়? পাঠক আপনারাই বলুন। হয়তো ভালো লাগতে পারে কিন্তু তাই বলে...। আমি চাইনি এ ধরনের মিথ্যা কথা তাকে বলতে।

আমি তখন একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। ভর্তি হয়ে কেবল ক্লাস শুরু করেছি। সেই আমাকে প্রথম খেয়াল করেছে এবং পছন্দ করে ফেলেছে ও তার বন্ধুদের জানিয়েছে। এরপরেই তাকে চিনেছি।

একই ক্লাসে পড়তাম আমরা। একদিন ক্লাস থেকে বেরুবার সময় আমার দিকে তাকিয়ে হাটছে, আর ওমনি হোচট খাওয়া। যারা ব্যাপারটি খেয়াল করলো সবাই খুব হাসলো, আমিও। ব্যাপারটি খুব এনজয় করেছিলাম। তখন থেকেই ভালো লাগতে শুরু করলো তাকে। ভাবতাম এতো সুন্দর ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে হোচট খায়। এ ও সম্ভব? (নিজেকে নিজের কাছে কখনো ভালো লাগতো না এবং বিশ্বাস হতো না।) এভাবে একটু একটু করে কথাবার্তা, ঘুরতে যাওয়া (ফ্রেন্ডরা থাকতো সঙ্গে), দুষ্টুমি, মারামারি করা ইত্যাদি। সম্ভবত দুই থেকে তিন দিন একা ঘুরেছি তার সঙ্গে। তখন সে আমাকে কয়েকবার বলেছে, তোমাকে চুমু দিতে ইচ্ছা করছে। আমি বলতাম, তা চলবে না।

হাত ধরতে চাইতো মনে মনে কিন্তু সুযোগ দেইনি। এ জন্য সে আমাকে বলতো, তোমার মধ্যে কোনো ইয়ে নেই। তাকে আমার খুব ভালো লাগতো কিন্তু কেন যে কি করলাম, আর কি করলাম না তাই বুঝলাম না। একদিন যখন সে মাথা ছুয়ে ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করলো তখন না বলাতেই কিছু পরেই বুঝতে পারলাম কতটা Hurt করেছি তাকে। কেদেছিল নিঃশব্দে, টের পাইনি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি মাথা নিচু করে আছে, চোখে পানি এবং চোখ লাল হয়ে গেছে। হাত দিয়ে পানি মুছছে। এরপরেও সে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, নোট দিয়েছে, প্রথম ঈদে ১০টি ঈদ কার্ড দিয়েছে । তাকে দুই চার দিন না দেখলেই বুঝতে পারতাম তার জন্য আমার একটু হলেও অনুভূতি রয়েছে। কিন্তু তার উপর মাঝে মাঝে আমার ভীষণ রাগ হতো আর রাগের কারণেই তার সঙ্গে মাসের মধ্যে হঠাৎ একদিন খুব দুষ্টুমি কথাবার্তা হতো আর বাকি উনত্রিশটি দিন তার দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিপাত, নিঃশব্দতা।

কলেজের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী সবাই জানতো তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে, মাত্র আমরা তিন চার জন বাদে। এরকম নীরবতা থেকেই তার সঙ্গে ধীরে ধীরে আমার সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা। তবে এখন মনে হচ্ছে সম্পর্কের অবনতির কারণে অন্তরালে আমার প্রতি তার সন্দেহ। মনে মনে সে আমাকে সন্দেহ করতো আমার একমাত্র এবং সবচেয়ে ভালো বন্ধুটিকে জড়িয়ে। যাকে আমি বন্ধু এবং বড় ভাই হিসেবে জানি, সেও আমাকে তাই। সেই ভাই বন্ধুটিই আমাকে একদিন বললো, তোর সঙ্গে নাকি আমার প্রেম ছিল এটা তোর ডালিম (প্রেমিক) আমাকে বললো। খুবই খারাপ লেগেছিল কথাটি শুনে। সে এতো খারাপ একটি সন্দেহ করে সম্পর্ক ছিন্ন করলো যা এতদিন ছিল ভাবনারও বাইরে। মনে মনে তাকে বাজে ভাবতে লাগলাম, যা ইচ্ছা তাই।

কিছুদিন আগে জানতে পারলাম সে নাকি অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করেছে, যে কি না তার চেয়ে দুই হাত লম্বা এবং আমার চেয়ে অসুন্দর। মেয়েটি আমাদেরই ইয়ারমেট ছিল একই কলেজে। সে একদিন বলেছিল, আমাকে না পেলে নাকি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সে তার চেয়ে লম্বায় বড় একটি মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। তাই মনে মনে প্রায়ই ভাবি জাতটা প্রকৃতপক্ষেই খুব খারাপ। তারপরও তাকে কেন যে এখনো অনুভব করি, হয়তো প্রথম ভালো লাগা তাই।

নাম ঠিকানা বিহীন

পরিণাম

রুবেল

২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়। চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। থাকার সমস্যা হওয়ায় প্রথমে চকবাজার এক মেসে উঠলাম। সেখানে পরিচয় হলো সালাউদ্দীনের সঙ্গে। আমাদের মেসের সদস্য ছিল দশজন। তার মধ্যে ছিল ছাত্র, ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবী। সালাউদ্দীন ছিলেন ছাত্র। তিনি আমার সাত আট মাস পরে মেসে উঠেছিলেন। প্রথমে তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের অনার্সের ছাত্র।

তিনি ওঠার পর থেকে বাসার এক একটি জিনিস হারিয়ে যেতে লাগলো। সদস্যদের মধ্যে দেখা দিল অবিশ্বাস। আমরা প্রথমে মনে করতাম বাইরের কেউ চুরি করছে। একে একে বই, ক্যালেন্ডার, ক্যাসেট প্রভৃতি হারিয়ে যেতে লাগলো। একদিন হঠাৎ বড় একটি শোপিস হারিয়ে গেল যার মূল্য ২-৩ হাজার টাকার ওপর। ওই শোপিসটা ছিল ব্যবসায়ী নাসির ভাইয়ের। শুরু হলো খোজাখুজি। সবাই চিন্তিত কখন কি হারিয়ে যায় এ ভেবে। গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব নিলাম আমি।

একদিন দোকানে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় সালাউদ্দীনের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। চা খেতে খেতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, গতকাল ছিল তার ছাত্রীর জন্মদিন যাকে সালাউদ্দীন মাঝে মধ্যে পড়াতো। জন্মদিনে সালাউদ্দীন তাকে দারুণ একটি উপহার দিয়েছে।

আমি উৎসাহী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, উপহারটা কি?

বর্ণনা শুনে আমি নিশ্চিত হলাম এটা আমাদের চুরি হওয়া শোপিস। তিনি আরো বললেন, সালাউদ্দীন নাকি মেয়েটিকে ভালোবাসে এবং এটা ছিল তার ভালোবাসার উপহার। মেয়েটির মা সালাউদ্দীনকে ভাই বলে ডাকতেন। তিনি মনে করেছিলেন ভাই হিসেবে বোনের মেয়েকে উপহার দিয়েছে।

রুমমেট রাসেলকে নিয়ে আমি ওই উপহারটা দেখতে গেলাম যেন তারা কেউ বুঝতে না পারে। সালাউদ্দীনকে খোজার নাম করে তাদের বাসায় গিয়ে দেখলাম, আমাদের নাসির ভাইয়ের শোপিস শোভা পাচ্ছে ভালোবাসার উপহার হিসেবে প্রেমিকার ড্রইংরুমে। রুমে এসে সবাইকে ঘটনা জানালাম।

রাতে সালাউদ্দীন বাসায় ফিরলেন। তারপর শুরু হলো বিচার। তিনি বাধ্য হয়ে সব কিছু স্বীকার করলো এবং প্রস্তাব দিলো যে, বাইরে থেকে এমন একটা কিনে দেবেন। কারণ ওই শো-পিস নিয়ে আসলে প্রেমিকার কাছে তার মান-সম্মান থাকবে না। কিন্তু রুমের কেউই সে প্রস্তাব মানতে রাজি নয়। আমরা বললাম, চোরের আবার কি মান-সম্মান বা ভালোবাসা? শেষে সবাই মিলে তার প্রেমিকার বাসা থেকে শোপিস নিয়ে এলাম।

সালাউদ্দীনের প্রেমিকার মা সব জেনে গেলেন। ওই মহিলা ছিলেন খুব সুন্দরী এবং ক্ষমতাধর। তার স্বামী থাকতেন বিদেশে। এ সুযোগে তিনি সরকারের অনেক উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সালাউদ্দীনের নামে মেয়ে অপহরণের অভিযোগে থানায় মামলা করলেন। মেয়েকে নানার বাড়ি রেখে সালাউদ্দীনকে প্রেমের মজা হাড়ে হাড়ে বোঝালেন।

সালাউদ্দীনকে না পেয়ে তার আত্মীয়-স্বজনকে পুলিশ জেলে ঢোকালো। জীবনে আর ওই মেয়ের বাড়ির আশেপাশে যাবে না এমন বন্ড দিয়ে সালাউদ্দীন নিজেকে মুক্ত করলেন। প্রেমের সমাধি ঘটিয়ে ছাত্র জীবন ত্যাগ করে সালাউদ্দীন গ্রামের পথ ধরলেন এবং শুনলাম কিছু দিনের মধ্যে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করবেন।

আমরা যখন বিবিএ ফার্স্ট ইয়ারে তখন গনিভাই ছিলেন এমবিএর ছাত্র। তার ভালোবাসা ছিল টাকার প্রতি। তিনি এতো বেশি পরিশ্রম করতেন যে আমার অবাক লাগতো। দিন-রাত টিউশনি করে দশ হাজার টাকার ওপরে আয় করতেন। তিনি সব সময় একটা কথা বলতেন, রুবেল, ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট/সেকেন্ড

ইয়ারে ছেলেরা ঘোরে মেয়েদের পেছনে প্রেম করার জন্য কিন্তু মাস্টার্সের মেয়েরা ঘোরে ছেলেদের পেছনে বিয়ে করার জন্য। এখন বাস্তবেও তাই মনে হয়।

এমবিএ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করার জন্য পাত্রী দেখতে লাগলেন। এমন সময় পরিচয় হলো কালো মেয়ে কলির সঙ্গে। সে এসেছিল বিএড করতে। বিএড কলেজে বেশির ভাগ মেয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলে। তিনিও সদ্য এমবিএ পাস ছেলেকে টার্গেট করলেন। গনিভাই মেয়েদের সংস্পর্শে কমই এসেছেন। তিনি কলি আপার ফাদে সহজে ধরা পড়লেন।

গনিভাই সব কিছু আমাকে বলতেন। একদিন এসে বললেন, আমি বিয়ে করবো কলিকে। বিনিময়ে এক লাখ টাকা যৌতুক ও কালো আনারকলি যার একটি চাকরি আছে। সেদিন আমি বলেছিলাম, আপনি মনে হয় ঠিক কাজ করছেন না।

কিন্তু কলি বিয়ের আগে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে এমন ফাদে আটকালেন যেখান থেকে বের হওয়া কষ্টের। সেদিন গনিভাই হেরে গেলেন টাকার কাছে। কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া এক লাখ টাকা হাতে নিয়ে কাজি অফিসে আমিসহ তিন–চারজন মিলে গেলাম। বিয়ে হয়ে গেল।

আজ মনে হয় গনিভাই সুখে নেই। কিন্তু তার একটি ভালো চাকরি আছে। অনেক টাকা আছে, নেই মানসিক শান্তি। কারণ যৌতুকের বিয়েতে নেই কোনো আনন্দ।

ঠিকানা বিহীন
tofailmk@yahoo.com

বড্ড পাগল

কেমন আছো। নিশ্চয়ই ভালো আছো! আজ কেন জানি তোমার কথা বার বার মনে পড়ছে। আগে তোমার কথা মনে পড়লে আমার হৃদয় দিয়ে তোমার হৃদয়ের কাছে পৌছে যেতে পারতাম। এখন এমন হয় না কেন!

তুমি আমাকে ফোনে এতো কথা বলতে। তোমার পাগলামি ভরা কথাগুলো খুব মনে পড়ে। তুমি হঠাৎ ফোনে কথা বলা বন্ধ করে দিতে। তোমার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে যন্ত্রণা বোধ করতাম। খুব কষ্ট পেতাম। মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারতাম না। তোমার প্রতি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তুমি ফোন না করলে সহ্য করতে পারতাম না। আমার শরীর দিনের পর দিন খারাপের দিকে যেতে লাগলো। একদিন ডাক্তার দেখালাম। সব কিছু পরীক্ষা করালাম। রিপোর্ট এলো। আমার দীর্ঘ দিনের জটিল রোগ ধরা পড়লো। যা এখনও বহন করে যাচ্ছি। হয়তো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত করতে হবে। তুমি হয়তো কোনোদিন জানবে না, আমার জটিল রোগের কারণ। আমি তো জানি সেই রোগের কারণ।

রোগ ধরার পর তেমন সুস্থ থাকি না। আমার শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। চেহারায় কোনো লাবণ্য নেই। মাঝে মাঝে ভাবি, তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতাম। তোমার কথাগুলো কানে শুনতাম। সেই পাপের ফল না তো। তোমার কথাগুলো ছাড়া আমাকে কখনো পাপ স্পর্শ করেনি। তুমি আমার কথায় মনে কিছু নিও না। মনে এলো তাই বললাম।

তোমাকে আমার আজীবন মনে থাকবে। তুমিই আমার মধ্যে ভালোবাসার জন্ম দিয়েছিলে। আমাদের সম্পর্কটা ছিল নিয়তির রসিকতা।

তোমার সঙ্গে যখন কথা বলতাম তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। কথা বলার সময় আমাদের আবেগ এতো গভীর আন্তরিক ছিল ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তুমি আমার অদৃশ্য আত্মা।

তোমাকে বলেছিলাম, বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা কোনোদিন শেষ হয় না। তোমার কাছে বন্ধুত্ব আশা করি। কখনো বন্ধুত্বের অমর্যাদা করো না। বড় মাপের ভালো বন্ধু হয়ে থাকো। কখনো কোনো নিমন্ত্রণ করলে তুমি এসো। আশা করি কথাটা ফেলবে না। আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড – সেটা করবে না।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কীট ও ফুল

আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। এ বয়সে সবার যা হয় আমার সমস্যাও ছিল তাই। সারাক্ষণ মাথায় শুধু মেয়েদের চিন্তা। এ নিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুবীরের সঙ্গে যে কতো পরিকল্পনা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। শেষে একদিন সুবীরের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের যে কোনো উপায়ে নারী মাংসের স্বাদ নিতেই হবে। যেই ভাবা সেই কাজ।

একদিন সকালে আমি আর মলয় ঘুম থেকে উঠে কাউকে কিছু না জানিয়ে গোয়ালন্দ ঘাটের ট্রেনে উঠলাম। গোয়ালন্দ ঘাটে গিয়ে পৌছলাম দুপুর দুইটায়। এখানেই আছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পতিতাপল্লী। দুপুরে কিছু খাওয়া-দাওয়া করে একটা বোর্ডিংয়ে উঠলাম। বোর্ডিং ম্যানেজারের কাছে পতিতাপল্লীর নিয়মকানুন শুনে রাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু রাত আর আসে না। অনেক অপেক্ষার পর রাত আটটার দিকে খাওয়া-দাওয়া করে দুরু দুরু বুকে পতিতাপল্লীর ভেতরে গেলাম। ভেতরে গিয়ে দেখি সারি সারি মেয়ে দাড়িয়ে আছে। যার যাকে পছন্দ হচ্ছে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমি একজনকে পছন্দ করলাম, সারা রাতের জন্য পাচশ টাকা। মেয়েটার নাম নূরী। সে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেল। ভেতরে ঢুকে আমার তো অবস্থা খারাপ! কারণ এ ধরনের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। অবস্থা টের পেয়ে মেয়েটা আমার সঙ্গে গল্প শুরু করে দিল। তার জীবনের অনেক কাহিনী শুনলাম। নূরী তার চাচাতো ভাইকে খুবই ভালোবাসতো। কিন্তু তাকে কখনোই এসব বুঝতে দেয়নি। ইতিমধ্যে তার চাচাতো ভাই আরেক মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তাই নূরী রাগ করে দৌলতদিয়ায় চলে আসে। হায়রে ভালোবাসা! কাউকে তুমি নিয়ে যাও স্বর্গে, আর কাউকে...।

এরপরও আমার বিস্ময়ের বাকি ছিল। শুনলাম, নূরীর পাশের রুমের নিশিকন্যা সুফিয়ার মন আজ খুবই ভালো কারণ তার প্রেমিক আজ আসবে! কিছুক্ষণ পর দেখি এক ছেলে সত্যি সত্যি অনেক উপহার নিয়ে এলো। ছেলেটা খুবই মিশুক। সবার সঙ্গে খুব হাসিঠাট্টা করছিল। আমার সঙ্গেও দেখা করতে এলো। কিন্তু সারাক্ষণ আমি খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম। জানি না, ছেলেটা সুফিয়াকে কতোটা ভালোবাসে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, খুবই ভালোবাসে, একদিন এখান থেকে সুফিয়াকে নিয়ে যাবে।

ভালোবাসা শুধু চার অক্ষরের একটা শব্দ নয়। বরং এমন একটা শক্তি যা একটি সুন্দর ফুলকে নরকের কীটে পরিণত করতে পারে আবার নরকের কীটকেও স্বর্গের ফুলে পরিণত করতে পারে।

রাজশাহী থেকে
manik_shaha@yahoo.com

আম্মি

দিলরুবা নুসরাত নূপুর

আমার মা চাকরি করেন। ছোটবেলা মাকে খুব কম কাছে পেয়েছি। ছয় মাস বয়স থেকে আমাকে পর্যায়ক্রমে নানু, খালা, কাজের মেয়ে, বাসার আশপাশের লোকজন সবার কাছেই থাকতে হয়েছে। এদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে বেশি কাছে পেয়েছি, ভালোবেসেছি সে আমার আম্মির হাজবেন্ড, যাকে আমি আব্বু বলে ডাকতাম। তিনি আমাদের ওইখানে পোস্ট অফিসে চাকরি করতেন। সেই সুবাদে তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।

আম্মির কাছে আমাকে রেখে মা স্কুলে যেতেন। তাদের বাসার সবাই আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো। সব সময় তাদের বাসায় থাকতাম। ছোটবেলায় আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতো, তোমার বাবার নাম কি?

তাহলে আমি আব্বুর নাম বলতাম, কখনোই বাবার (আমার জন্মদাতা) নাম বলতাম না। আম্মি অথবা আব্বুকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতো তাদের ছেলেমেয়ে কয়জন? তারা বলতো দুই ছেলে দুই মেয়ে। তাদের দুই ছেলে এক মেয়ে ছিল। আম্মির ভালোবাসা দেখে মাঝে মাঝে মনে হতো আমি তারই সন্তান, ভুলক্রমে আল্লাহ আমাকে অন্য ঘরে পাঠিয়েছেন।

কিছুদিন পর আব্বু বদলি হলেন। তারা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু বাবা রাজি হলেন না। যাবার সময় আম্মি-আব্বু খুব কান্নাকাটি করলেন। ছোট্ট সেই আমি খুব কেদেছিলাম। অনেকদিন তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়নি। তারা চলে যাওয়ার ছয় সাত বছর পর আমার বাবা মারা গেলেন। সেই খবর শুনে তারা সবাই আমাদের বাসায় এসেছিলেন।

আমি যখন কলেজে ভর্তি হলাম তখন সর্বপ্রথম তাদের বাড়ি গেলাম। আমাকে দেখে আব্বু-আম্মি খুব খুশি হয়েছিলেন। তারপর পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় তাদের বাড়ি আর যাওয়া হয়নি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার অনেকদিন পর তাদের বাড়ি গেলাম।

যাওয়ার পরই আম্মির কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আব্বু কোথায়?

কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আম্মি আমাকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেদে ফেললেন। বললেন, তোর আব্বু চিরদিনের মতো চলে গেছেন।

শুনে কেন জানি একটুও কাদতে পারিনি। যাকে এতো ভালোবেসেছি তার জন্য কেন কাদতে পারছি না? শুধু তাকিয়ে থাকলাম।

আম্মি কাদতে কাদতে বললো, মারে ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছিস, যাকে দেখে বাবার কষ্ট ভুলে থাকতি, আব্বু বলে ডাকতি তাকেও হারালি, তোর মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই।

শুনে আমি বললাম, না, আম্মি আমি খুব সৌভাগ্যবতী। আমি এমন বাবাদের সন্তান যারা এদেশের গর্ব, মুক্তিযোদ্ধা। তারা আমার আদর্শ। আমি তাদের সন্তান হয়ে গর্ব বোধ করি।

কিন্তু কথাটি সেদিন আম্মির কানে পৌছায়নি কারণ এটা ছিল আমার অব্যক্ত কথা।

বরিশাল থেকে

ছোট

চার বছর প্রেম করার পর বিয়ে নামের ভয়ঙ্কর শুভ কাজে যোগী হচ্ছি। দাম্পত্য জীবন কতোটা সুখের হবে বুঝতে পারছি না। কিন্তু সুখ পাচ্ছি এই ভেবে, আমাদের প্রেম অকালে ঝরে পড়েনি। বিয়ের আগে প্রেম অন্য দশজনের মতো মনে হলো না।

আমার মতে, অবাধ প্রেম কেবল বিয়ের পরই সম্ভব। তাই বিয়ের আগে প্রেমকে প্রেমের ভিত্তি বলেই মনে করি। বিয়ের আগে উভয়ের কিঞ্চিৎ ভাব বিনিময় দুরস্ত বলেই মনে করি। এ ক্ষেত্রে আমি একশ ভাগ কামিয়াব। কামিয়াব কিভাবে হলাম, বর্ণনা করলে মন্দ হয় না।

তার ছদ্ম নাম *ছোট*। একদিন বললাম, ছোট আমি তোমাকে...।

জবাব এলো ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। কারণ পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা।

তার নীরব সম্মতি আমাকে আরো বেগবান করলো। ফলে পৃথিবীতে আরো এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা বৃদ্ধি পেল। যখন তখন কাছে আসা, কথা বলা নিয়ম হয়ে দাড়ালো। সুযোগ পেলেই একজন আর একজনের বুকে চেপে থাকলাম। চাপাচাপি অবস্থায় একদিন এক জোড়া চোখের চাপায় পড়ে গেলাম। কি বিব্রতকর পরিস্থিতি!

শেখরের ঘরে যেমন যাতায়াত করতো ললিতা, ঠিক সেরকম যাতায়াত ছিল আমার ঘরে ছোটর। প্রায় সকালে ঘরে ঢুকে মাথায় হাত বুলিয়ে কপালে চুমু দিয়ে আমায় জাগিয়ে দিতো। তারপর আমার একটি

হাত নিয়ে তার পৃষ্ঠদেশের পেছন দিয়ে পেচিয়ে বুকের ওপর স্থাপন করতো। ভালোবাসায় বুকটা ভরে যেতো।

গভীর রাতে যখন ছোটকে নিয়ে ভাবতাম কে যেন আমাকে বলতো– এটাকে হারাস না, শক্ত হাতে ধরে রাখিস। হারাবার ভয়ে কোর্ট ম্যারেজ করলাম। কিন্তু প্রকাশ করলাম না পারিবারিক সম্মানের কথা ভেবে। যখন ছোটর জন্য পাত্র দেখা হচ্ছিল তখন জানলাম, আমরা উভয়েই বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি।

ঘোষণা প্রকাশের পর কর্তৃপক্ষ এমনভাবে আমাকে রিমান্ডে নিল, যেন মনে হয় আমি সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলাভাই। রিমান্ড শেষে সাক্ষ্য–প্রমাণাদির ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, উভয়ে যেহেতু একে অপরকে ভালোবাসে এবং কাছে পেতে আগ্রহী, তাই বাংলাদেশ বিবাহরীতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে ধুমধামে তাদের বিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হোক। যাতে তারা গায়ে গা লাগিয়ে কথা বলতে, হাতে হাত ধরে পথ চলতে পারে।

ঐতিহাসিক রায় পাবার পর ছোটকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। কিন্তু মিলিত হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ পঞ্জিকা দেখা হচ্ছে ভালো একটা দিন এলেই...। অতএব, ততোক্ষণ ১৪৪ ধারা। এ অবস্থা দেখে লোকে বলছে প্রেম আর আমি বলছি জ্বালা।

হায় ছোট! কি করে বলি তোমায় ভালোবাসি কতো। তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না বলে রাগ করো না। ইচ্ছা তো হয় কিন্তু পারি না। কারণ এখন আমি অবলা পুরুষ।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রলাপ

আনিকা তাবাসসুম রূপা

আমি রূপা। ঢাকার একটি নামকরা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজিতে অনার্স পড়ছি। কিছুদিন আগের একটি ঘটনা আমাকে সম্পূর্ণ রূপে বদলে দিয়েছে। জীবন তো একটাই, কোনো না কোনোভাবে হয়তো কেটে যাবে। বর্তমান স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে আমাকে। ফলে এখন অনেকটাই ভালো আছি। এজন্য প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাই সৃষ্টিকর্তাকে, এরপর তুলীপু (ছোট আপু) আর আমার বন্ধু যারা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মানুষের জীবনে অপ্রত্যাশিত অনেক ঘটনা–দুর্ঘটনা ঘটে যায়। শত চেষ্টা করেও তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। ভালোবাসা আমার জীবনে সে রকমই একটি ঘটনা।

এসএসসি পাস করে সবেমাত্র কলেজে পড়ি। নভেম্বরের শেষের দিকে ঢাকায় এক আত্মীয়ের বিয়েতে যাই। আমরা ছিলাম মেয়ে পক্ষ। গায়েহলুদ অনুষ্ঠানে শাড়ি পরে মেয়ের পাশে কয়েকজন বসেছি। এ সময় লক্ষ্য করি সামনে চার পাচটি ছেলে কি যেন বলাবলি করছে আর আড়চোখে আমাদের দেখছে। তারা ছেলেপক্ষ থেকে এসেছে। বড়দের সিরিয়াল শেষে যখন তাদের ওপর দায়িত্ব এলো মেয়েকে হলুদ দেয়ার, ঠিক তখনই ঘটে বিপত্তি। তাদের মধ্যে একজন মেয়েকে হলুদ দেয়ার পাশাপাশি আমার কপালে হলুদ লাগায়। এতে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। কিন্তু প্রকাশ করিনি। গায়ে হলুদ পর্ব শেষে খাওয়ার পর তাদের জন্য হালকা বিনোদনের আয়োজন করা হয়। আয়োজক আমরাই। লটারির মাধ্যমে একেকজনকে একেকটা বিষয় নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যেমন নাচ, গান, কৌতুক, অভিনয়, ক্যাটওয়াক ইত্যাদি। অনেকটা ইচ্ছা করেই তাকে দেয়া হয় নাচ লেখা কার্ড। অমনি সে সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমার হাত ধরে নাচতে নিয়ে যায়। এ রকম উদ্ভট আচরণে আমি নির্বাক হয়ে পড়ি। সে মিউজিকের সঙ্গে নাচতে থাকে। মাঝপথে সিডি অফ করে জানতে চাই এসব কি, কেন করলেন?

সে সোজাসাপ্টা উত্তর দেয় আমার ভালো লেগেছে, আমি করেছি। আমার ভালো লাগাকে প্রাধান্য দিয়ে অনেক কিছুই করতে পারি। ঝগড়া বেধে যায় আমাদের মধ্যে। যাইহোক, পরদিন রাগ করে ছেলের বাড়ি

হলুদ অনুষ্ঠানে যাইনি। সেই দুষ্টু ছেলেটির পরিচয় জানতে পারি এক আপুর কাছে। সে একটা প্রাইভেট মেডিকালে প্রথম বর্ষে পড়ে। আমাকে নাকি অনেক খুজেছিল সেদিন।

পরদিন বরযাত্রী রিসিভ করতে যখন আমরা গেটে ব্যস্ত হঠাৎ তার চোখে চোখ পড়ে যায়। আমাকে দেখে একটা প্রশান্তির হাসি হাসলো। মনে হচ্ছিল মহা মূল্যবান কিছু একটা হারিয়ে আবার সেটা খুজে পেয়ে অপলক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে।

এদিকে আমি তো রেগে আগুন। তাদের বসার ব্যবস্থা করে চলে আসছি, এমন সময় পাশ থেকে কেউ একজন আমার নাম ধরে ডাকে। অবাক হয়েছি ঠিক, তাকাইনি। কয়েক পা এগোতেই সামনে সে। তিন চারটা প্রশ্ন এক সঙ্গে করে – কেমন আছেন, গতকাল যাননি কেন ইত্যাদি। অনুমতি ছাড়াই আমার ছবি তুলে ফেলে। আমি কিছু বলার আগেই বলে, এটাও আমার একান্ত ভালো লাগা থেকেই করা। আপনাকে খুব ভালো লেগেছে, আমাকে আপনার ভালো লাগুক বা না লাগুক কিছু যায় আসে না। আমাকে একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দ্রুত চলে যায়। এভাবে ঝগড়া দিয়ে আমাদের সম্পর্কের সূত্রপাত। বেশ কিছুদিন পর আমাদের বাসায় সে ফোন করে, কথা হয়। এরপর প্রায়দিন আমাদের পড়াশোনা, পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে কথা হতো। দেখা হতো খুব কম।

এরই মধ্যে বুঝতে পারি একজন আরেকজনকে কতোটুকু চাই, অনুভব করি। তথাকথিত প্রেম বলতে যেমনটি বোঝায় আমরা তাতে বিশ্বাসী ছিলাম না। তাই কোনো আধুনিকতার ছোয়া লাগতে দিইনি আমাদের পবিত্র প্রেমে। স্বপ্নের কথা আমার মা কিছুটা জানতেন।

আমার বাবা মায়ের ইচ্ছা আমি যেন পড়াশোনা শেষ করি। তার আর আমার মধ্যে কথা হয়েছিল আগে পড়াশোনা শেষ করবো, পরে বাবা মাকে পছন্দের কথা জানাবো। সব কিছু ঠিকঠাক মতোই চলছিল। গত বছর এমবিবিএস পাস করে সে যখন ইন্টার্নি করছিল, হঠাৎ আমার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে থাকে।

জীবনে খুব বেশি কিছু চাইনি, না চাইতে যা পেয়েছি তাই নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম। হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে তাকে আকড়ে সুন্দরভাবে বাচার স্বপ্ন দেখতাম। শেষ পর্যন্ত পারলাম কই! কেউ একজন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমার স্বপ্নকে কেড়ে নিয়েছে।

নিজের জীবনের চেয়ে যাকে বেশি ভালোবাসতাম সে এখন কি না এমন একজনের যার তাকে [স্বপ্নকে] পাওয়ার কথা ছিল না। অথচ সেই এখন আমার স্বপ্ন–র ওপর তার সব অধিকার কর্তৃত্ব দেখাচ্ছে। নিয়তি বুঝি এ রকমই নিষ্ঠুর হয়।

স্বপ্ন–র বিয়েটা প্রথম দিকে আমি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারিনি। প্রচণ্ড শকড করেছিল আমাকে। নাওয়া–খাওয়া ভুলে শুধু ভাবতাম কেন এমন হলো! পড়াশোনা, গান শোনা, টিভি দেখা, হই চই কোনোকিছু ভালো লাগতো না। শুধু কাদতাম। মনে হতো আমি বুঝি মরে যাবো। রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়েছি, শারীরিক, মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি।

এতোকিছুর পরও স্বপ্নকে প্রতারক ভাবতে বা দোষারোপ করতে পারছিলাম না। কারণ বিয়ের আগে আমাকে সে সব কিছুই জানায়। সে পরিবারের বড় ছেলে হওয়ায় দায়িত্বটা বেশি। আমাদের পরিবারেও আমাকে নিয়ে বাবা মায়ের অনেক আশা। দুই পরিবারের গার্ডিয়ানদের মতের প্রাধান্য দিতে গিয়ে আজ আমরা একজন আরেকজনের কাছ থেকে অনেক দূরে। হয়তো বা এ বিচ্ছেদ ভালোর জন্যই।

তার দাদি মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে অনুরোধ করে বিয়ে করতে। দাদিকে সে খুব ভালোবাসতো। আমি পড়া শেষ না করায় অনেক কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বলি দাদির ইচ্ছা পূরণ করতে। আমিও তাকে শ্রদ্ধা করতাম। স্বপ্ন চঞ্চল হলেও খুব ইমোশনাল ছিল। যেদিন আমাদের শেষ দেখা হয়, আমার হৃদয়টা কাচের মতো ভেঙে টুকরোটুকরো হয়ে যাচ্ছিল, তবুও চেষ্টা করেছি শক্ত থাকতে। তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। ঠিক মতো কথা বলতে পারছিল না, ছেলে হয়েও অঝোরে কাদছিল।

আজ সে অন্য একজনের। জানি হয়তো কখনো দেখা হবে না, অনেকদিনের চিরপরিচিত পথে এক সঙ্গে হাটবো না। এখনো কিছু স্মৃতি, তার শিশুসুলভ নিষ্পাপ মুখটি যখন মনে পড়ে, নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। হারিয়ে ফেলি নিজেকে অতীতের স্মৃতির আধারে, নিদারুণ বিষণ্নতায় ছেয়ে যায় মন। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, স্বপ্ন আমার! তুমি ফিরে এসো, তোমার ইমু [আমাকে এ নামে ডাকতো]–র কাছে। প্রতিটা ক্ষণ, প্রতি মুহূর্ত সে শুধু তোমার কথা ভাবছে।

আমার এ অর্থহীন প্রলাপ তার কানে কখনোই প্রতিধ্বনিত হবে না।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

ম্যারেজ ডে

সোনিয়া

আমি সোনিয়া। আমার ভালোবাসার নাম সাজু।

চুপি চুপি বলি, আর কাউকে বলবেন না কিন্তু। আজ আমাদের বিয়ে বার্ষিকী। আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি। ভ্যালেনটাইনস ডে। এ দিনে ভালোবাসার মানুষটি চিরদিনের জন্য আমার হয়ে গেছে। অবশ্য ভদ্রলোক আরো অনেক আগেই আমার হওয়ার কথা ছিল।

১৯৯৮ সাল। ১ অক্টোবর। কথা নেই বার্তা নেই সাজু হুট করে আমাকে বললো, আমরা ৫ তারিখে বিয়ে করবো।

আমি ভাবলাম সাজু আমার সঙ্গে মজা করছে। তাই আমিও তার সঙ্গে মজা করার জন্য বললাম, ঠিক আছে।

তখন সবার হাতে মোবাইল ছিল না। সব সময় খোজ–খবর নেয়া যেতো না। যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল আমাদের সঙ্গে যেদিন দেখা হবে সেদিন বলে দেয়া আবার কবে দেখা হবে। কথামতো ৫ তারিখে সকাল ১১টার পরিবর্তে দুপুর দুটায় দেখা হলো।

কিছুক্ষণ পর সাজু আমাকে বললো, চলো যাই।

কোথায়?

আজ আমরা বিয়ে করবো না?

আমি হেসে উঠলাম।

সাজু বললো, হাসছো কেন?

আমি আজ মামার সঙ্গে ঢাকা যাচ্ছি। পৌনে তিনটায় আমাদের বাস। বলেই উঠার প্রস্তুতি নিলাম। সাজু শাদামাটা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব নিয়ে চলে এলাম।

এর পরের ঘটনা ১৯৯৯ সালে।

আমার চাচাতো বোন এবং বান্ধবী স্বপ্না আমাকে ও সাজুকে প্রচণ্ড রকমের পছন্দ করতো। সে কারো কাছে আমাদের গল্প করলে এমনভাবে করতো শুনে মনে হতো আমরা এ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দুজন মানুষ।

স্বপ্না খুব আন্তরিকতার সঙ্গে চাইতো আমাদের দুজনের যেন খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়। এটা নিয়ে আমার সঙ্গে কয়েক দিন ঘ্যান ঘ্যান করলো। আমি নিষেধ করায় সে সিদ্ধান্ত নিল সাজুর সঙ্গে এটা নিয়ে আলাপ করবে।

আমার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কল্যাণীকে (আমার বান্ধবী) নিয়ে একদিন সাজুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। উদ্দেশ্য বিয়ে নিয়ে আলোচনা। কি লজ্জার কথা! আল্লাহ আল্লাহ করতে লাগলাম যেন সাজুর সঙ্গে তাদের দেখা না হয়। কার কপাল ভালো জানি না তবে সাজুর সঙ্গে সেদিন তাদের দেখা হয়নি।

এর মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাস এসে গেল।

ওই বছর ফেব্রুয়ারি মাস ছিল ২৯ দিনে। সাজু ফেব্রুয়ারির প্রথম থেকেই আমাকে বোঝাতে লাগলো ২৯ তারিখে বিয়ে করলে চার বছর পর একবার ম্যারেজ ডে হবে। খুব মজা হবে। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। ২৮ তারিখে যখন আমাদের সঙ্গে দেখা হলো তখন সে খুব করে আমাকে বললো, চলো আমরা কাল বিয়ে করে ফেলি।

আমি বললাম, মা অসুস্থ। মাকে নিয়ে ঢাকায় সিএমএইচ–এ যেতে হবে। মার অসুখের কথা শুনে সে চুপ হয়ে গেল।

আমি ২৯ তারিখে ঢাকা যাইনি, গিয়েছি ১ মার্চ। কিন্তু ওই দিন সাজুর সঙ্গে দেখা করিনি। বিয়ে করবো না বলেই। সাজু কষ্ট পেল কি না বোঝা গেল না। কখনো বোঝা যায় না। সে এমনই।

২০০০ সালের জানুয়ারির ১৫ তারিখে আমার বড়আপার প্রথম বাচ্চা হলো। আপা খুবই অসুস্থ ছিল। তার বাচ্চা হলো সিজার করে, সেও অসুস্থ। তাকে আরেক হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। আপার প্রচণ্ড ব্লিডিং হতে লাগলো। তাকে রক্ত দেয়া, ওষুধ এনে দেয়া, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা এসব কাজ সাজুই করেছে। এমনকি আপাকে তার নিজের রক্ত পর্যন্ত দিয়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্য সবাই খুব আপত্তি করেছিল। কারণ সে এমনিতেই খুব দৌড়াদৌড়ি করছে তার ওপর রক্ত দিতে হলে তার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আপাকে পাচ ব্যাগ রক্ত দেয়া হয়েছে। আর ডোনার ক্লাবে রক্ত ছিল না বলে বাধ্য হয়ে তার কাছ থেকে এক ব্যাগ রক্ত নেয়া হয়েছে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে সাজুর এভাবেই পরিচয়। এরপর সাজুকে আমাদের বাড়ির সবাই খুব পছন্দ করতো কিন্তু আমাদের সম্পর্কের কথা কেউ জানতো না। তাছাড়া আমার ইচ্ছাই ছিল না তাকে বিয়ে করার।

সে এমন একজন মানুষ যে ভালো বন্ধু হতে পারে কিন্তু ভালো স্বামী হতে পারে না।

পরবর্তী সময়ে তাকে যখন একথা বলেছি, তখন সে কিছু বলেনি। শুধু নীরবে চোখের পানি ফেলেছে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার সকল যুক্তি তর্ক ভাষা হারিয়ে ফেললাম। তার সেই বোবা চোখের অশ্রুর স্রোতধারা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে তার বুকে ঠাই করে দিয়েছে।

আমি বানভাসি ক্ষুদ্র প্রাণীর মতো খড়কুটো আকড়ে ধরতে গিয়ে বটগাছের শীতল ছায়াতলে আশ্রয় পেয়েছি যেন।

২০০১ সালের থার্টি ফার্স্ট নাইটে আমাদের কৃশ্চিয়ান ফ্রেন্ড বাপ্পির অনুরোধে আমি, সাজু, বেলাল আরো দশ বারো জন বাপ্পির বাসায় রাতে থাকলাম। খিচুড়ি মাংস রান্না করে খেলাম। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে গল্প করলাম। এক পর্যায়ে সাজু আমাকে বললো, সোনিয়া চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারির পর থেকে সাজু আমাকে আর কখনো বিয়ের কথা বলেনি। শুধু চিঠিতে লিখেছে সে এখন বেকার বলে আমি তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছি না। আমি খুব হিসেবি, স্বার্থপর। তার চিঠির কোনো প্রতিবাদ করিনি। পরে ভেবেছি তাকেই বিয়ে করবো কিন্তু কথাটা কখনো তাকে বলিনি। কখনো বলতামও না। তাই সে যখন বিয়ের কথা বললো আমি তেমন কোনো প্রতিবাদ করলাম না। অবশেষে ঠিক হলো আমরা ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেনটাইনসডে–তে বিয়ে করবো।

আমাদের বিয়েতে ঢোল বাজেনি। বাজেনি সানাই। লাল বেনারসি পরে বৌ সাজিনি। মাথায় হাত দিয়ে কেউ আমাদের আশীর্বাদও করেনি। শুধু একজন উকিল সাহেব বাসায় এসেছেন আর আমরা দুজন তার সামনে বসে স্ট্যাম্পের ওপর স্বাক্ষর করেছি। ব্যস হয়ে গেল বিয়ে।

মানুষের দেহকে যদি আকাশের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সাজুর দেহটা ওই নীল আকাশ। আর তার হৃদয়টা পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাদ।

সাজু আমার স্বামীর নাম। আজ সাজু আমার। আমার শব্দটার মধ্যে যে কতোখানি অধিকার, আত্মতৃপ্তি মেশানো আছে এটা এমনি করে কাগজে লিখে বোঝানো যেতো!

আমি ভালোবাসি সাজুকে।

ভালোবাসি!

ভালোবাসি!
ভালোবাসি!
যায়যায়দিন পত্রিকা না থাকলে হয়তো আমার এ কথাগুলো কখনোই কাউকে বলা হতো না।
কথাটা কি ঠিক হলো?
আমার এ কথাটা অনেকের কাছেই বলেছি। তারপরও মনে হয় যেন কাউকেই বলা হয়নি।

ফরিদপুর থেকে

স্ন্যাপ শট

শাহরিয়ার

সবকিছু যেন সৃষ্টিকর্তা মিলিয়ে দিয়েছেন। ২০০১ সালের ১৮ মে আন্দালিবের স্পষ্ট মনে আছে, চোখ বন্ধ করলে মনে হয় সব জীবন্ত। কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র হয়ে ম্যানেজমেন্টের কোর্স করার নিয়মের গুষ্টি উদ্ধার করতে করতে ক্লাসে ঢুকেছিল।
১১৩৫ নাম্বার গ্যালারির বিজনেসের ছাত্রদের মধ্যে কমপিউটারের তারা মাত্র তিনজন দেখে বিরক্ত হয়েছিল। শালার সিস্টেমের... মারি বলেই মাথা ঘোরাতেই স্তব্ধ হয়ে যায়। গাঢ় নীল রঙের ড্রেসে এ যে শাদা পরী। হাসলে গালে টোল পড়ে, মায়া ভরা চোখে উদাস ভাব, চমৎকার ব্যক্তিত্ব – এ যে এতোদিন স্বপ্নে দেখেছে। এভাবেই আন্দালিবের জীবনে লায়লার আগমন।
আন্দালিব তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। বিধাতা নিশ্চয়ই মুচকি হেসেছিলেন সেদিন। আন্দালিব ক্লাসে যায়, পড়া হয় না কিছুই, জিপিএ–৩.৬৯ থেকে ৩.০৬–এ আসে, কোর্সে চরম খারাপ হয় তার রেজাল্ট। দেখতে দেখতে তিন মাস শেষ হয়ে যায়, তাকে আর বলা হয়ে ওঠে না মনের কথা। আবার নতুন সেমিস্টার শুরু হয়। ক্যাম্পাসে আন্দালিবের দুই চোখ তাকে খুজে বেড়ায় কিন্তু লায়লার দেখা নেই। এক সেমিস্টার পর লায়লা আবার ফিরে এলো। কম বন্ধু থাকায় ক্লাস শেষে কখনোই পাওয়া যেতো না তাকে।
প্রেমের বিষয়ে বরাবর লাজুক আন্দালিব সাহস করে প্রপোজ করতে পারে না। নিজের সঙ্গে ক্রমেই যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে একদিন সুযোগ মতো বলে মনের কথা। আগে জানলে সে এ কাজ করতো কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হয়তো সে স্বপ্নের রাজকন্যার সঙ্গে কাটিয়ে দিতো বাকি জীবন। যখন জানলো স্বপ্নের রাজকন্যাকে তার ঘুম ভাঙার আগেই হারিয়ে ফেলেছে (কারণ লায়লা বিবাহিত ছিল) ওই দিন আন্দালিব খুব কাদলো। বিধাতা নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বারের মতো মুচকি হেসেছিলেন।
এর পরের কাহিনী আরো করুণ। দিন যায় রাত আসে তবু সে তাকে ভুলতে পারে না। এমন কোনোদিন নেই যেদিন তাকে মনে পড়েনি।
লায়লা এরপর কানাডার একটি ইউনিভার্সিটিতে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে চলে যায়। কানাডার শুভ্র বরফে হয়তো হারিয়ে যায় লায়লা। এ জন্য আন্দালিবের পড়ালেখা ঠিকমতো শেষ হয়েছিল। অনার্স শেষ করার পর ভালো একটা চাকরি হলো। চাকরি করেই রেকর্ড পরিমাণ জিপিএ নিয়ে মাস্টার্স শেষ করলো। এবার মা বিয়ের কথা বললেন। কোনো মেয়েই মনে ধরে না। ধরবেই বা কেন, তার মন তো লায়লাকে খোজে। তার একটা লায়লা চাই। সারা দিন হাসি–খুশি। একা হলেই জড়িয়ে ধরে একই ভাবনা। এদিকে ক্রমাগত সবার বিয়ের কথায় মন বিষিয়ে ওঠে আন্দালিবের। এ সময়ই আন্দালিব লন্ডনে এমবিএ–তে স্কলারশিপসহ অ্যাডমিশন পায়। সময় খুব দ্রুত চলে যায়, সব কাজ শেষ করে পা বাড়ায় লন্ডনের পথে। বিধাতা মনে হয় আবারো মুচকি হাসলেন।
২০ সেপ্টেম্বর, আন্দালিব চলে যাবে। এয়ারপোর্টে বসে ভাবছিল সব কেমন স্বপ্নের মতো হয়ে গেল, স্ন্যাপ শটের মতো ভেসে উঠছিল সব। আজ সকালে শেভ করার সময়ও লায়লার কথা একবার মনে হয়েছিল।

অবশেষে ইমিগ্রেশনে ডাক পড়লে সংবিৎ ফিরে আসে। বৃটিশ এয়ারওয়েজের বিশাল প্লেনে সিট খুজে যখন হয়রান তখনই হাতের বামে দেখে ১৬ নাম্বার সিট, রিকোয়েস্ট করে উইন্ডো সিট নিয়েছে। পাশে একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটা ব্যাগ গোছাচ্ছে। এক্সকিউজ মি বলতেই যখন সে মাথা তুলে মিষ্টি হেসে তাকালো, স্তব্ধ হয়ে গেল আন্দালিব। এতোটুকু বদলায়নি, সেই টোল পড়া মিষ্টি হাসি, সেই চোখ। লায়লা নয় তো, এ কি করে সম্ভব! সে তাকে চিনতে পারেনি। পরিচয় গোপন রেখেই আন্দালিব আলাপ শুরু করলো। আশ্চর্য হয়ে শুনলো, তারা একই ইউনিভার্সিটিতে এমবিএ করতে যাচ্ছে, তাদের হলও এক। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালো আন্দালিব। এ কথা শুনে লায়লাও বেশ খুশি। অনেকটা লায়লার উৎসাহে তারা পাশাপাশি রুম নিল। সম্পূর্ণ একটা নতুন জীবন শুরু হলো।

পড়ালেখায় এতো উৎসাহ কখনো পেয়েছে কি না আন্দালিব ভেবে পায় না। এমএস–এ এতো পড়ালেখা, আসলে সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার বাহানা মাত্র। ভালোই সময় কেটে যাচ্ছিল। দুজনে এক সঙ্গে হাটতে বের হয়, হাটতে হাটতে চলে যায় টেমসের পারে (গৃনিচের পাশেই টেমস নদীর একটা অংশ আছে)। আন্দালিব সব সময় চেষ্টা করে টেমসের তীরে যেতে। এ জায়গায় এলেই লায়লা কেমন যেন হয়ে যায়, মন খুলে সব বলতে থাকে। কিভাবে শাশুড়ির পছন্দে তার বিয়ে হয়, দিনের পর দিন তার মানিয়ে চলার সংগ্রাম, স্বামীর চরম অবহেলার (স্বামীর পূর্ব প্রেমের জন্য) মাঝে মানিয়ে চলার চেষ্টা। চরম উচ্ছৃঙ্খলতার এক পর্যায়ে লায়লার বাবার সম্পদের ওপর তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। মানসিক অত্যাচার যখন শারীরিক অত্যাচারে রূপ নেয়, লায়লা তখন বাধ্য হয় ঘর ছাড়তে। কখন যে লায়লার হাত আন্দালিব নিজ হাতে তুলে নেয় কেউই টের পায় না। মনের অজান্তে গাল বেয়ে নোনা জল নেমে আসে আন্দালিবের। সংবিৎ ফিরে পেয়ে লায়লা হাত সরিয়ে নেয়। এর পর আন্দালিব আরো কেয়ারিং হয়ে ওঠে।

এদিকে ক্লাসে আন্দালিবের আগে কেউ যেতে পারে না, ক্রমেই টিচারদের প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠে। লায়লার সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ পর্যায়ে পৌছে যায়। আন্দালিব ল্যাপটপে একটা ফাইল মেইনটেইন করতো অনেকটা ডায়রির মতো। একদিন লায়লা ফাইলটা ডকুমেন্ট লিস্ট থেকে ভুলে খুলে ফেলে এবং পড়ে। যতোই পড়ে, আশ্চর্য হয়ে যায়। প্রতিটি লাইনে লায়লাকে না পাওয়ার হাহাকার। প্রতিটি শব্দ যেন এক একটা ডুকরে ওঠা বোবা কান্না। একটা মানুষ কতোটা ভালোবাসতে পারে, কতোটা রাগ তার জন্য মনের ভেতর পুষে চলেছে (পরে আন্দালিব জেনেছে) লায়লা যেন অনুভব করলো। ভালোবাসার সংজ্ঞা আবার নতুন করে নির্ধারিত হয় তার মনে।

আন্দালিব ভেবে পায় না কিভাবে শুরু করবে। লায়লাকে ছাড়া কোনোভাবেই চলবে না। এই ভার যেন আর নিতে পারছিল না। এদিকে লায়লাও তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে আবার নিজেকে প্রশ্নের মুখোমুখি করে এবং উত্তরও পেয়ে যায়। নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে অবশেষে আন্দালিব মনের কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয়।

একদিন আন্দালিব–লায়লা লন্ডন বৃজের মাঝামাঝি দাড়িয়ে নিচের ছোট লেজার ট্রপের নৌকা দেখছে। এমন একটা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আন্দালিব শুরু করলো কিন্তু লায়লা প্রথমেই থামিয়ে দিল, সেই সঙ্গে মিষ্টি হাসি দিয়ে বললো, আমি জানি।

ঠিক এই হাসিই দেখেছিল প্রথম ক্লাসে। কিন্তু লায়লা কিছু বলে না। কনকনে ঠাণ্ডায় আন্দালিব ঘামতে লাগলো, তবে কি সে আমাকে ভুল বুঝলো। এমন সময় তাদের সামনে দিয়ে চায়নিজ পর্যটক দম্পতি হাত ধরে হাটছিলো, তা দেখে আন্দালিব মনের অজান্তে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে। লায়লা তখন মনে মনে হাসছে, ওপরের তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে দেখছেন তারা কি করে।

লায়লা বলে, দেখেছো কি সুখী জোড়া।

আন্দালিব বলে, একের প্রতি অন্যের প্রচণ্ড ভালোবাসা থাকলেই এমন সুন্দর রিলেশন গড়ে ওঠে। আবারও বড় একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে যায়। মনের অজান্তে আন্দালিব বলে ফেলে আমার যদি কেউ এমন

থাকতো। তারা হাটতে থাকে। লায়লা আস্তে করে আন্দালিবের হাত ধরে। চমকে ওঠে আন্দালিব। লায়লা তার সেই ভুবন ভোলানো হাসি দেয়। আন্দালিবের ভেতরটা চুরমার হয়ে যায়। দুজনে আরো জোরে হাত ধরে, যেন কোনোভাবেই এ হাত না ছোটে।

আব্বু কার্টুন শেষ, ডিস্ক চেঞ্জ করো।

আমি যেন স্বপ্ন থেকে ফিরে এলাম।

আমার বৌ বলে, আবার ঘুমিয়ে পড়লে কেন? কতো কাজ পড়ে আছে। মনে আছে আজ শপিং করতে হবে?

আমরা কেন্টে স্থায়ীভাবে থাকবো বলে ঠিক করেছি। কিন্তু লায়লা বাংলাদেশে ফিরতে চায়। এ নিয়ে আমাদের অনেক কথা হয়। আমি বার বার তার মিষ্টি হাসির কাছে হেরে যাই। আমি ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছি আর সে লয়েড ব্যাংকে ব্রাঞ্চে কাজ করছে। পিএইচডি শেষ করেই আপনাদের কাছে, বাংলাদেশে ফিরে আসবো।

জিলিংহাম, কেন্ট, ইংল্যান্ড থেকে
mail2shahryer@yahoo.com

অপেক্ষা

এন হক

স্বামীহারা আমি এক অসহায় নারী। সংসার নামের ভাইয়ের নরকে নানান লাঞ্ছনায় ধুকে মরছি। কেউ আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। ভাই, ভাইবৌ সবার কাছে আমি আজ অবাঞ্ছিতা। মাঝে মধ্যে মনে হয় আত্মহত্যা করে এ নরক থেকে উদ্ধার হই। কিন্তু পারি না। তার ক্ষমা ছাড়া বিধাতার নরকেও যে আমার ঠাই হবে না। অপেক্ষায় আছি কখন সুযোগ আসবে তার কাছে একটিবার ক্ষমা চেয়ে নেয়ার।

দুষ্টুমির ছলে আমাদের পরিচয়। প্রথম দেখায় আমাকে তার ভালো লেগে যায়। আমার মোটেও ভালো লাগেনি। তাকে ভালো লাগার কোনো ফুরসত ছিল না। নাজমুলকে এর আগেই ভালোবেসেছিলাম। নাজমুলের ডলারের গন্ধে তাকে মূল্যায়ন করতে পারিনি। তবে সে নত হওয়ার পাত্র ছিল না। মাঝে মধ্যেই এটা সেটা উপহার পাঠাতো, আমাকে নিয়ে কবিতা লিখে পাঠাতো।

কদিন পর জবার চিঠি আসে। চিঠি পড়ে ভেঙে পড়লাম। নাজমুল বিবাহিত, তার ঘর সংসার আছে। তবুও তার আমাকে চাই। আমি চাইলে সে তার স্ত্রীকে তালাক দেবে। দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়লাম। কি করবো আমি?

আস্তে আস্তে ভুলে যেতে চেষ্টা করলাম।

নাজমুলকে ভুলতে গিয়ে মনের অজান্তেই তার আরো কাছে আসতে লাগলাম। তবে ধরা দিইনি। কিন্তু তার বন্ধুর পাতা ফাদে পা পড়ে গেল আমার। তার ছায়া ছাড়া সমাজে ঠাই হারিয়ে ফেললাম।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালে তাকে গোপনে বিয়ে করি। অথচ বছরখানেক আগে ভালোবাসা দিবসেই তাকে জানিয়েছিলাম আমার অপছন্দের কথা। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সে ফোনে অনুরোধ করে পরের দিন একটু সময় দেয়ার জন্য। আমি হ্যা না কিছু বলিনি। বেচারা মৌনতাকে সম্মতি ভেবে পরদিন ঢাকা থেকে আসে। দিনভর পার্কে অপেক্ষা করে বিকেলে আমার মেসে আসে। দেখা করার মতো সৌজন্য বোধটুকুও দেখাইনি আমি। নূপুরদি তাকে সাফ জানিয়ে দেন, আপনাকে সে পছন্দ করে না।

মাস ছয়েক গোপন রাখার পর তার পরিবার ও সমাজের তিরস্কার সব কিছু মাথায় নিয়ে সে আমাকে বধূ হিসেবে বরণ করে নেয়। আমার বাবা তার কাছে বিক্রি করে দিয়ে বেচে যান।

বিয়েতে সে আমার বাপের বাড়ি থেকে এক টুকরো সুতাও উপহার পায়নি। এতে অবশ্য তার কোনো দুঃখ ছিল না।

আমাকে পেয়েই সে ছিল মহা খুশি। আমার জন্য সে সবই করতে পারতো। আমার বায়না মেটাতে তার নাভিশ্বাস উঠতো, তবুও তার প্রতি আমার কোনো করুণা জাগতো না।

আমার স্বার্থপরতা ও পরিবারের অবমূল্যায়নের কারণে তাকে আমি হারিয়ে ফেলি। শীতের রাত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। বাথরুমে যাবো। দেখি সে পাশে নেই। লাইট অন করি। বালিশের ওপর এক টুকরো কাগজ চোখে পড়লো।

এক জীবনের কতোটাই বা আর বাকি রইলো। এ সময়টুকু তোমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারলাম না। পারলে একজনকে খুজে নিও। যাওয়ার সময় বালিশের নিচ থেকে তোমার পাওনা দেনমোহর নিয়ে যেও।

ইতি

তোমারই অযোগ্য স্বামী

ঠিকানা বিহীন

প্রস্তুতি

আমি ছোট্ট একটি চাকরি করি। সে সুবাদে অন্য এলাকায় কর্মরত ছিলাম। তিন দিনের ছুটিতে বাড়ি আসি। সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় হয়। হঠাৎ পাশের বাড়ির সুন্দরী ভাবীর কথা মনে পড়ে। দিনটা ছিল শুক্রবার, ২০০৪ সাল। বিকালে চলে যাই তার বাড়িতে। সাক্ষাতে কেমন আছেন, ভালো আছি বাক্য বিনিময় হয়। ভাবী চা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। মন ভালো আর খারাপ থাকা নিয়ে কথা ওঠে।

আমি বলে উঠি, যার তিনটি জিনিস সুন্দর তার সব সময় মন ভালো থাকে। যেমন– সুন্দর হাতের লেখা, সুন্দর কণ্ঠস্বর ও সুন্দর স্বামী কিংবা স্ত্রী।

এ কথা বলতেই তিনি বলে উঠলেন তার একটি নেই, সুন্দর স্বামী।

এভাবে কথা শুরু হয়। কথার ছলে বলে ফেলি যদি আমি আপনার স্বামী হই! তিনি নির্দ্বিধায় বললেন, তাহলে তো কথাই নেই। আমার তিন দিনের ছুটি শেষ। কিন্তু তার মায়াভরা ভালোবাসা ব্যবহারে কোনোমতে মন চাচ্ছে না কর্মস্থলে যেতে। দশ দিন থেকে যাই। ভাবীর স্বামী প্রবাসী। তাকে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে, বিভিন্ন স্পটে, পার্কে, গার্ডেনে, সি–বিচে ঘুরে বেড়িয়েছি। এরই মধ্যে দুইজনের মাঝে প্রেমের ভাব সৃষ্টি হয়। যে দিন কর্মস্থলে চলে যাবো সে দিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে দুগাল চুমুতে ভরে দিলেন। আমিও আদর করলাম। তিনি বললেন, আমাকে ভুলবে না তো। সারা রাত ঘুমাতে পারিনি।

দুইজনের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল আলাপ হয়। চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন নামিদামি হোটেলে রাতযাপন ও দৈহিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। প্রতিদিন দেখা করার জন্য নিজের এলাকায় চলে আসি। দুইজন এমন পর্যায়ে পৌছেছি একজন আরেকজনকে না দেখলে এক মুহূর্তও চলে না। দুইজনে ঘরসংসার করার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলি। সামাজিক বৈধতার জন্য আদালত এবং কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করার দিন–তারিখও নির্ধারণ করি।

কিন্তু যাওয়া হয়নি। বাধা হলো সমাজ, স্ব–স্ব পরিবার ও আত্মীয়স্বজন। তারপরও দুইজনের শপথ আমরা একে অপরকে ছাড়তে রাজি নই। আমরা ঘরসংসার করবো সবার আড়ালে। কেউ আমাদের পৃথক করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। এ নিয়ে অনেকবার মানঅভিমান, কথাকাটাকাটিও হয়েছে। এখন দুইজনে খুব প্রেম করছি। বর্তমানে আমরা দুইজন ঘর বাধার অপেক্ষায় দিন গুনছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

চট্টগ্রাম থেকে

আলোকিত দিন

ভোলা নাথ পোদ্দার

ভালোবাসা কি করতে পারে বোঝার চেষ্টা করি না বলে আমাদের দেশে ভালোবাসা অবহেলিত। নোংরামিকে কি আমরা ভালোবাসা বলি? ভালোবাসা কখনো নোংরামি হতে পারে না। ভালোবাসা কোনো মুখরোচক গল্পের উপাদান নয়। আপনি সমাজকে এবং সমাজের মানুষকে ভালোবাসা দিন। দেখবেন সমাজ থেকে হানাহানি, রক্ত ঝরা, খুন ও রাহাজানি সব বন্ধ হয়ে যাবে।

ভালোবাসা বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী, আবার আকাশের মতো উদার। ভালোবাসা কোনো বৃদ্ধ রাজনীতিকের বিয়ের মুখরোচক গল্প নয়, কোনো মাদকাসক্তের বেহায়াপনা নয়। কিংবা কোনো প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের এসিড ছোড়া নয়। ভালোবাসা সৃষ্টির উৎস প্রতিটি ঘর, প্রতিটি মন এবং প্রতিটি প্রিয় মানুষ।

ভালোবাসার মূল্যায়ন হলে বেহায়াপনার গল্প কমে যাবে, পথে-ঘাটে মেয়েদের উত্যক্ত হতে হবে না। আমরা ভালোবাসাকে মূল্যায়ন করতে শিখলে হয়তো কোনো তাজ মহল সৃষ্টি হবে না, তবে পৃথিবীর জন্য বাংলাদেশ সৃষ্টি হতে পারে নতুন কোনো দৃষ্টান্ত। কারণ ভালোবাসার নির্দেশনা ছাড়া ঘর, সমাজ, দেশ বা জাতি চলে না। এমনকি ভালোবাসার সর্বব্যাপী অবক্ষয় দেখা গেলে পৃথিবী অচল হয়ে পড়তে পারে।

মিরপুর রোড, ঢাকা থেকে